"দুনিয়ার মজদুর এক হও"

১০ম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব

(২-৫ নভেম্বর, ২০১৯, কংগ্রেসে গৃহীত)

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

১. আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১.১ ২০০৮ সালের মহামন্দার পর বিশ্বপুঁজিবাদ পুনরায় স্থিতিশীল হবে এমন ভবিষ্যদবানী করা হয়েছিল। কিন্তু, বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রাতিষ্ঠানিক সংকট কাটেনি, বরং তা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি, পুঁজিবাদি উন্নত দেশেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর নেমে এসেছে শোষণের বোঝা। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে অথবা সংকুচিত করা হচ্ছে জনগণের কল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক অধিকার। অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা তীব্রতর হচ্ছে শ্রমজীবি মানুষের উপর। তার ফলে, সে সকল দেশের শ্রমজীবি ও গণতান্ত্রিক মানুষ প্রতিরোধে নেমে আসছে রাস্তায়। পুঁজিবাদের নয়া-উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক নীতির ফলে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা বৈশ্বিকভাবে একদেশ থেকে অন্যদেশের মধ্যে, আবার সকল দেশের নাগরিকদের মধ্যে আভ্যন্তরীন ভাবেও। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য দৃঢ় ও অব্যাহত রাখার জন্য এবং নিজের অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্ররা বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নয়া-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও সামরিক হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে তুলেছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়াসহ 'লিমা গ্রুপে'র অধিকাংশ দেশের মধ্যে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি মদদ দিচ্ছে এবং ক্ষমতায় বসিয়েছে। সম্প্রতি ভেনিজুয়েলায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য হুয়ান গুয়াইদোকে তৈরী করা হয়েছে অনুপ্রবেশের পুতুল হিসেবে। সার্বিকভাবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে নিঃশেষ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সময়কালে, ইউরোপ-লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশেই দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ও আসলে মার্কিন পুঁজির সবচাইতে দক্ষিণপন্থী অংশের বিজয়। তবে, বিশ্ব-পুঁজিবাদের নিজস্ব সংকটের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বৈশ্বিকভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে অন্তঃবিরোধেরও জন্ম হয়েছে। ব্রেক্সিট, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে, ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রন চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে মতবিরোধ স্পষ্টতই এর প্রমান। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, যে একমেরু বিশ্বের জন্ম হয়েছিল, তারপর বিগত এক দশকে 'বহুমেরু' বিশ্বের প্রবনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদ জল, স্থল, আকাশ ও মহাকাশে তার একাধিপত্য অব্যাহত রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক অসহযোগিতা ও চুক্তিভঙ্গের মধ্য দিয়ে হুমকির সম্মুখীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রত্যাহারের ফলে ডব্লিওটিও (WTO) এর বহুবিষয় আজ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব স্বার্থে বহুপাক্ষিক সমঝোতার বদলে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা তৈরী করছে। বিশ্বসংকটের এই চিত্রের পাশপাশি, বিশ্ব-পুঁজিবাদের সকল বৈরিতা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে এ সময়কালে চীনের অর্থনৈতিক শক্তি ও বৈশ্বিক প্রভাব বেড়েছে, ভিয়েতনাম ও কিউবা তাদের অর্থনীতিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি লাভ করেছে। পারমাণবিক চুল্লি ও ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়াকে কোনঠাসা করার মার্কিন প্রয়াস উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতৃত্বের দৃঢ়তায় ও কুশলতায় কিছুটা হলেও স্তিমিত। অক্টোবর বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির গভীর বিশ্লেষণ জরুরী, কারণ বিশ্বের সার্বিক এই পরিস্থিতি প্রভাবিত করছে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর দেশে দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি।

নয়াউদারনীতিবাদ ও বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংকট:

১.২ আগেই বলা হয়েছে, বিশ্ব-পুঁজিবাদ ও তার নয়াউদারিকরণ নীতি আজ সংকটের মুখোমুখি। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া বিশ্ব-পুঁজিবাদের মহাসংকটের এক দশক পর উন্নত দেশগুলোর ব্যাপক জনগণের মধ্যে এই সচেতনতা দৃশ্যমান হয়েছে যে, নয়া-উদারিবাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিগানের ও বৃটেনে মার্গারেট থ্যাচারের হাত ধরে, কয়েক দশক পর তার ফলশ্রুতিতে লাভবান হয়েছে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী, ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এই নীতির প্রভাবে এক দুরূহ অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুই বা আড়াই দশক-বিশ্বপুঁজিবাদ তার স্বর্ণযুগ অতিক্রম করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ তাদের

জীবনযাত্রার মানের উন্নতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু, ১৯৭২ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে সে দেশের নিচুতলার ১০ শতাংশ মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে দৃশ্যমান পর্যায়ে এবং উচু তলার ১০ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান ও আয় বেড়েছে লাগামহীনভাবে। এই বৈষম্য আজ সে দেশের মানুষকে ১ শতাংশ ও ৯৯ শতাংশে বিভক্ত করে দিয়েছে। বর্তমানে সেখানে একজন পূর্ণকালিন শ্রমিকের প্রকৃত আয় তার চার দশক আগের আয়ের চেয়ে কম। নীচুতলার ৯০ শতাংশ মানুষের প্রকৃত আয় গত তিন দশক ধরে স্থবির অথবা প্রকৃত আয় পিছিয়ে পড়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ২৫ টি উন্নত অর্থনীতির দেশের গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ পরিবারের আয় হয় স্থবির অথবা প্রকৃত আয়ে পিছিয়ে পড়েছে। ২০০০ সালের 'গ্যালাপ পোল' এর হিসেব অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ আমেরিকান নিজেদেরকে শ্রমজীবি মানুষ বলেছে, ২০১৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪৮ শতাংশে। বৈশ্বিক জনসংখ্যার বিশাল অংশ আজ এই বৈষমের শিকার। এর ফলে, বিশ্বব্যাপী তৈরী হয়েছে ব্যাপক ক্ষোভের। এই বাস্তবতা নিঃসন্দেহে এক নতুন রাজনৈতিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, নয়া-উদারনীতিবাদের এই সংকট সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ ও বৈরিতা তৈরী করেছে।

১.৩ অবস্থা এতটাই নাজুক যে, ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দার পর বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি, বিংশ শতাব্দি শেষের দিকে তার যে অবস্থা ছিল, সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদ বৈশ্বিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি 'বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে পুঁজির ঘনীভবন'এর পথ গ্রহণ করেছে। যার ফলে, বিশ্বব্যাপী তৈরী হচ্ছে নজীরবিহীন অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ব্যাপক দুর্দশা আর কষ্টের।

১.৪ ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংক বিশ্ব জি ডি পি বৃদ্ধির এক উচ্চাশা পোষণ করে। বলা হয়, ২০১৬ সালের জিডিপি ৩.২ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ৩.৬ শতাংশ, ২০১৮ সালে ৩.৭ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে তা ৩.৮ শতাংশে উন্নীত হবে। কার্যতঃ তা হয়নি। আর যদি তা অর্জিত হয়ও, তাও তা ২০০০ সালের ৪ শতাংশ জিডিপির চেয়ে কম।

বৈশ্বিক বেকারত্ব:

১.৫ আই এম এফ দাবী করে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ২০১০ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৩ শতাংশ তা কমে ২০১৭ সালে হয়েছে ৫.৭ শতাংশ। কিন্তু, প্রকৃত চেহারাটি তা নয়। বেকারত্বের হারের তথাকথিত হ্রাস শ্রমজীবি মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোন সঠিক প্রতিফলন নয়। শ্রমজীবি মানুষের ২০১৬ সালের মজুরি বৃদ্ধি বা আয় বৃদ্ধি ছিল ১.৮ শতাংশ, ২০১৭ সালে তা ২.৩ শতাংশ দাবী করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে বৃদ্ধি ঘটেনি, কারণ প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে। এমনকি মহামন্দা পূর্ববর্তী (১৯৯৯-২০০৮) দশকে গড় আয় বৃদ্ধি ছিল ৩.৪ শতাংশ, তার থেকেও গড় আয় এখন কম। অধিকন্তু, সংখ্যার বিচারে এই বৃদ্ধি মনে হলেও, প্রকৃতঅর্থে, গুণগত বিচারে এই বৃদ্ধি আসল সত্য নয়। 'শ্রমবাজারের' নমনীয়তার' ("labour market flexibility") নামে 'মজুরি দৃঢ়তা' বা wage rigidity র মধ্য দিয়ে আসলে বৃদ্ধি পেয়েছে স্বল্প আয়, অস্থায়ী, নৈমিত্তিক আর স্বনিয়োজিত কাজ। আসলে এর মধ্য দিয়ে শ্রমজীবি মানুষের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে, অনিশ্চয়তা বেড়েছে। মুনাফা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা যা পুঁজিবাদের চিরায়ত চরিত্র। এর ফলে, প্রকৃত বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে, কর্মসংস্থান হয়েছে বাধাগ্রস্ত।

১.৬ 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' (Artificial Intelligence, AI) এবং রোবোটিক্স স্থান করে নিচ্ছে শ্রমের অনেক ক্ষেত্র। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের সংগে সংগে শ্রমজীবি মানুষের আন্দোলনে নতুন দিশা, শ্লোগান, কাজের ধরণ এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ জরুরী হয়ে পড়েছে।

১.৭ নয়া উদারনীতিবাদের কর্মনীতির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক পুঁজি ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিপুল 'তারল্য' অর্জন করেছে, কিন্তু দেশীয় বাজারে চাহিদার সংকটে এই পুঁজির বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়েছে। Financial Times এর রিপোর্ট মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ, ইউরোপীয়ান কেন্দ্রিয় ব্যাংক, ব্যাংক অব জাপান, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং সুইস ও সুইডিশ ব্যাংকে প্রায় ১৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে। এর ফলে, সম্পদ মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েছে, সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির হার কমেছে। এই অবস্থায় পুনরায় যদি কোন 'বুদবুদ বিস্ফোরণ'

হবার ঘটনা ঘটে, পুনরায় তাহলে অর্থনৈতিক মন্দা অনিবার্য। সার্বিকভাবে, আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি আজ এমন এক বিচিত্র অবস্থায় মুখোমুখি, যা পুনরায় আর এক দফা অর্থনৈতিক সংকট তৈরী করতে পারে।

বৈষম্যের বিস্তৃতি:

১.৮ ৯ম পার্টি কংগ্রেসে বিশ্বব্যাপী ধনবৈষম্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কয়েক বছরে নয়া উদারনীতিবাদের প্রভাবে বৈশ্বিকভাবে এবং বিভিন্ন দেশভিত্তিতে এ বৈষম্য বেড়েছে লাগামহীনভাবে। ধনী ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে আরও গরীব। এর মাত্রা বাড়ছে। ২০১৭ সালের 'Credit Suisse' মোতাবেক পৃথিবীর জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, বৈশ্বিক উপার্জনের ৭০.১ শতাংশের মালিক। অন্যদিকে, পৃথিবীর ৮৫.৬ শতাংশ মানুষ বৈশ্বিক উপার্জনের মাত্র ৮.৬ শতাংশের অংশীদার। World Inequality Lab (WIL) এর ২০১৮ সালের রিপোর্ট অনুসারে, ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বের ১ শতাংশ উপার্জনকারী জনগোষ্ঠী, নীচুতলার ৫০ শতাংশ মানুষের উপার্জনের দ্বিগুন উপার্জনের মালিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জরীপের ফলাফলে দেখা যায় - বৈষম্য বৃদ্ধির হার উপরতলার ১০ শতাংশ লোকের মধ্যে সর্বাধিক। সর্বশেষ জরীপ অনুসারে, বাংলাদেশের বৈষম্য বৃদ্ধির হার পৃথিবীর বহু দেশের চাইতে অনেক দ্রুত।

বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ:

১.৯ এটা সর্বজনবিদিত যে, বৈশ্বিক সংকটের এই প্রেক্ষিতে, পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমজীবি মানুষের উপর নিপীড়নের খড়গ নেমে এসেছে বেশী মাত্রায়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার, কৃষকের ন্যায্য পাওনার অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার সবক্ষেত্রেই নির্যাতন বৃদ্ধি ও অধিকার সংকুচিত হওয়ায় উন্নত দেশসহ উন্নয়নশীল বহু দেশেই অবহেলিত ভুক্তভুগী জনগণ বিক্ষোভ, প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, গ্রীসসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমস্যার ভিত্তিতে, পুঁজিবাদের সার্বিক সংকটের বিরুদ্ধে সম্প্রতি রাস্তায় তীব্র বিক্ষোভ, সমাবেশ হয়েছে। তবে, ৯ম কংগ্রেসেই বলা হয়েছে, এ সকল আন্দোলন সংগ্রাম ছিল প্রধানত: রক্ষণাত্মক, সেগুলো সীমিত ছিল নির্দিষ্ট দাবীদাওয়া, সংকটকে ঘিরে। রাজনৈতিক চেতনার অভাব তাতে ছিল বা আছে। কিন্তু, এটাও সত্য, এসব আন্দোলনই আসলে পুঁজিবাদের সার্বিক সংকটের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি এবং তাকে তাই এই লক্ষ্যে এই সংগ্রাম আরও দৃঢ়তর করাই ভবিষ্যতের কর্মপন্থা হতে হবে।

বিশ্বব্যাপী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বিপদ:

১.১০ পার্টির ৯ম কংগ্রেসে পৃথিবীব্যাপী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থানের বিপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। পৃথিবীর দেশে দেশে এই উত্থানের বিপদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ নয়া উদারনৈতিক নীতির আগ্রাসনের সংগে মিলিয়ে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, স্থানীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নানা ধরণের বিভেদ আর বৈরীতা সৃষ্টির এক লাগামহীন প্রয়াস চালিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত সব দেশেই দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বিকাশ ঘটেছে, প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বর্ণবাদ, বিদেশাতংক (Xenophobia), অতি দক্ষিণপন্থী নিও ফ্যাসিস্ট প্রবণতার। ভারতে মোদির নেতৃত্বে বিজেপির মত চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থানের শংকা ও বিপদের কথা ৯ম কংগ্রেসের দলিলে স্পষ্টত:ই উল্লেখিত ছিল। বাস্তবে তা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়, বৃটেনে ব্রেক্সিট ভোটের দিকে দক্ষিণপন্থী শক্তির সমাবেশ, ফ্রান্সের নির্বাচনে অতি দক্ষিণপন্থী মেরিন লে পেন (Marine Le Pen) এর শক্তিবৃদ্ধি, জার্মানীর বিকল্প ডয়েৎসল্যান্ড (Alternative to Deutschland) এর উদ্ভব, অষ্ট্রিয়ায় নতুন দক্ষিণপন্থী সরকারের ক্ষমতায় আসা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টে এক তৃতীয়াংশ দক্ষিণপন্থী সদস্যের অন্তর্ভূক্তি এই দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির উদ্ভব, জংগীবাদের বিস্তার-দক্ষিণ পন্থার বিকাশের সাক্ষী বহণ করে।

১.১১ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট বিস্তৃত হবার সংগে সংগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে, প্রশ্ন হচ্ছে, কারা জনগণের এই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারবে। এটা দৃশ্যমান যে, দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি একে কাজে

লাগিয়ে, সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। বাম প্রগতিশীল শক্তি অনেকক্ষেত্রেই প্রধান রাজনৈতিক বিকল্প শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসতে পারেনি। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি এই সংকটের বিপরীতে আরও দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রস্তাবকে সামনে নিয়ে আসছে যা শেষ বিশ্লেষণে জনগণের সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। তাই আজ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সংকটের বিপরীতে বাম প্রগতিশীল শক্তি কার্যকর বিকল্প হবে, নাকি দক্ষিণপন্থী শক্তি সে শূন্যতা পূরণ করে সভ্যতাকে আরও পিছনের দিকে ঠেলে দেবে, সে লড়াই চলছে এবং চলবে। ঐতিহাসিকভাবে এটা সর্বজনবিদিত যে, ১৯২৯-১৯৩০ সালের মহামন্দার সময় বিশ্বএকচেটিয়া পুঁজিবাদের সমর্থনেই গড়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদী শক্তি জনগণের সংকটকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বেও পুঁজিবাদের এই সংকট ও জনগণের ধূমায়িত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি ও নয়া ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠছে। এ বিপদকে ছোট করে দেখা যায় না।

বিশ্বব্যাপী বামপন্থী শক্তির বিকাশ:

১.১২ দক্ষিণপন্থার এই বিপদের মধ্যেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাম প্রগতিশীল শক্তি ও শ্রমজীবি সর্বহারা মানুষের লড়াই অব্যাহত রয়েছে। এ সময়কালে, ইউরোপে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তির ধারা ক্ষীণ ও দুর্বলতর হয়েছে। গ্রীসের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি PASOC, ফ্রান্সের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পাটি, ইতালির সোশ্যালিষ্ট পার্টি, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিসহ স্ক্যানডানেভিয়ান বিভিন্ন দেশে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলো নির্বাচনে খারাপ করেছে এবং দুর্বলতর হচ্ছে। কারণ তারা নয়া উদারনীতিবাদকে সমর্থন করে শ্রমজীবি জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছিল। ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন সময়ে তারা জনগণকে নিজেদের দিকে টানতে পারলেও ক্ষমতায় গিয়ে নয়াউদারীবাদী নীতির মুখাপেক্ষী হয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর বিপরীতে, পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টি (PCP) ও গ্রীস কমিউনিস্ট পার্টি (KKE) বিকাশমান শক্তি হিসেবে সামনে এগিয়ে এসেছে এবং নির্বাচনেও ভালো ফল করেছে। সাইপ্রাসে কমিউনিস্ট পার্টি (AKEL) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভালো ফল করেছে। এ ছাড়াও গ্রীসে সাইরিজা (Syriza) , স্পেনে প্রগতিশীল (PODEMOS) নয়া বামপন্থী দল হিসেবে এগিয়ে এসেছে যা বামধারার রাজনীতিতে শক্তি যুগিয়েছে। বৃটেনে জেরেমি করবিনের (Jeremy Corbyn) এর নেতৃত্বে লেবার পার্টি নির্বাচনে মধ্যপন্থার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে বার্নি স্যান্ডার্স শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে সমর্থন ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ সকল অগ্রগতি প্রমান করে বাম ও বামঘেঁষা শক্তি দৃঢ়তার সংগে নয়া উদারনৈতিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে দাঁড়ালে এই শক্তি কার্যকরভাবে জনগণের মধ্যে স্থায়ী অবস্থান ও সংগঠন তৈরী করতে সক্ষম। যাতে জনগণের ক্ষোভ সঠিকভাবে পুঁজিবাদী সংকটের বিপক্ষে পরিচালিত হতে পারে, যা দক্ষিণপন্থার বিপদকেও রুখে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন:

১.১৩ বৈশ্বিক পুঁজিবাদের এই সংকটের পটভূমিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বেড়ে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে অথবা ন্যাটোর আড়ালে মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর দেশে দেশে তার সামরিক অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে । মার্কিন-ইসরাইল যৌথ অশুভ ঐক্য মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র সংকটের জন্য দায়ী। ন্যাটো প্রথমবারের মত বাল্টিক দেশসমূহ ও পোল্যান্ডে তার সৈন্য সমাবেশ করেছে। এর মূল লক্ষ্য রাশিয়াকে ঘেরাও ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির উপর তার আধিপত্য অব্যাহত রাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় তার রণনৈতিক লক্ষ্য নিয়েই 'চীন ঘেরাও' নীতি অবলম্বন করেছে। মার্কিন আধিপত্যের 'একমেরু বিশ্ব' যাতে কোনমতেই 'দ্বিমেরু বা বহুমেরু' বিশ্বে পরিণত হতে না পারে, তারজন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া।

১.১৪ আগেই বলা হয়েছে, নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়, আসলে মার্কিন পুঁজির সবচাইতে রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী অংশের প্রতিনিধিত্বের বিজয়। জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে দক্ষিণপন্থী শক্তি ক্ষমতায় আসে-এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নির্বাচনের পূর্ব থেকেই ট্রাম্প একের পর এক জাত্যাভিমান, বৃহৎ পুঁজির নির্লজ্জ স্বার্থরক্ষা, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিষয়গুলোকে রাখ ঢাক না রেখেই প্রচার করেছে। লাতিন

ও এশিয় অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছে। আর জয়ী হবার পর, সে তার সকল রণনৈতিক ও কৌশলগত পদক্ষেপ নিয়েছে নয়াউদারবাদী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সর্বাংশে রক্ষা করার ঘোষণা দিয়ে । ইরান, প্যালেস্টাইন, কিউবা, আফগানিস্তানসহ বহু বিষয়ে পূর্বে গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে ট্রাম্প সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাব গ্রহণ করে গোটা কোরিয় পেনিনসুলায় যুদ্ধাবস্থা তৈরীর পদক্ষেপ নিয়েছে। উত্তর কোরিয়াকে ধ্বংস করে দেবার ঘোষণা দিয়েছিল।ভেনিজুয়েলার আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তোলার নাটক করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল ও সৌদি আরব তার সকল অপকৌশলের আর উত্তেজনা-সংঘাত সৃষ্টির অশুভ মিত্র।

সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি ও যুদ্ধাবস্থার বিপদ:

১.১৫ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলার কৌশল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি করছে তাদের সামরিক ব্যয়। বিশ্বব্যাপী সমরাস্ত্র বিক্রির প্রতিযোগিতাকে বিস্তৃত করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জিডিপির ৩.৫৮ শতাংশ ব্যয় করছে সামরিক খাতে, যেখানে বিশ্বের গড় সামরিক ব্যয় ২.৩ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৮ সালে তার বাজেটে ৭০০ বিলিয়ান ডলার বরাদ্দ করেছে সামরিকখাতে। ন্যাটোর সমগ্র ব্যয়ের ৭০ শতাংশ বহন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা। ২০১৪ সালে ন্যাটোর ব্যয় বৃদ্ধি পায় ১.৪ শতাংশ, ২০১৫ সালে ১.৮ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪.৩ শতাংশে। বিশাল এই সামরিক ব্যয়ের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বিশ্ব আধিপত্যকে অব্যাহত রাখছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ লাতিন আমেরিকা, ইরানসহ পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় তার সামরিক আধিপত্য অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার রণনৈতিক লক্ষ্য কেন্দ্রিভূত করেছে। তার প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ নৌশক্তি এখন দক্ষিণ চীন সাগরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিরোধের সুযোগে আঞ্চলিক অনুপ্রবেশের পাঁয়তারা খুঁজছে। তার এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য 'চীন ঘেরাও' নীতি, যা শেষ বিশ্লেষণে বৈশ্বিক আধিপত্য রক্ষার অংশবিশেষ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধংদেহী নীতিকে কার্যকর করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের যে কোন অংশে যুদ্ধাবস্থা তৈরীতে তৎপর যা গোটা বিশ্বকে যুদ্ধাবস্থার বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

লাতিন আমেরিকা:

১.১৬ আগেই বলা হয়েছে, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার নয়া উদারনৈতিক নীতি অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। বিষয়টির কিছুটা সবিশেষ বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। লাতিন আমেরিকার জনগণ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান সংঘাতের প্রেক্ষিতে সে এলাকায় মার্কিনের রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের পথ তৈরি করা হচ্ছে। বহু দশক ধরে কিউবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু। ট্রাম্প এটাকে বাড়িয়ে তুলছে। বারাক ওবামার গৃহীত সাময়িক শান্তি ও সমঝোতার পদক্ষেপকে উল্টে দিয়ে ট্রাম্প কিউবার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমনে নেমেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি সর্বত্রই দক্ষিণপন্থী শক্তিকে প্রকাশ্যে মদদ দিয়ে ক্ষমতায় আনছে অথবা আনতে চেষ্টা করছে। গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তার নয়া-উদারনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে যে বাম-প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ হয়েছে তাকে নস্যাৎ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া হয়ে উঠেছে, যাতে এই মহাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তারা তার আধিপত্য ফিরে পায় এবং অব্যাহত রাখতে পারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্ররা তাদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য নির্লজ্জ ও নগ্নভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। আর্জেন্টিনায় দক্ষিণপন্থী নিও লিবারেলপন্থী মরিস ম্যাকরি (Maurice Macri) কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে তারা সফল হয়েছে। তেমনিভাবে, সাংবিধানিক ক্যু এর মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দিলমা রৌসফ (Dilma Rousseff) কে সরিয়ে চরম ডানপন্থী জায়ার বোলসোনারো (Jair Bolsonaro) কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে। ব্রাজিলের সাবেক জনপ্রিয় নেতা ও প্রেসিডেন্ট লুলাকে সাজানো দুর্নীতি মামলায় সাজা ও কারাদন্ড দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে ডানপন্থীদের ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। ভেনিজুয়েলায় মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সে দেশের জনগণ, সেনাবাহিনী ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন, রাশিয়া, কিউবা, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, ইরান, তুরস্ক ভেনিজুয়েলার জনগণ ও প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে দৃঢ় সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। ফলে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। কিন্তু, এ ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। অথচ হন্ডুরাসে ২০১৭ সালে, ২৬ নভেম্বর সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রকাশ্য কারচুপির মধ্য দিয়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হার্নান্দেজকে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন ও সকল সহযোগিতা করে যাচ্ছে। নির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষেভের মুখেও হার্নান্দেজ মার্কিন সহায়তায় ক্ষমতায় টিকে আছে। সেখানে ২০০৯ সালে, সে দেশের বৃহৎ খনি মালিক ও মিষ্টির দোকানের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থে ক্যুদেতার প্ররোচনা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হন্ডুরাস ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মার্কিন হস্তক্ষেপের ইতিহাস দীর্ঘ। নিকারাগুয়ায় ড্যানিয়েল ওর্তেগা পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিকারাগুয়াসহ বলিভয়া, ইকুয়েডর, চিলি সর্বত্র তাদের নগ্ন অনুপ্রবেশ, হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।

পশ্চিম এশিয়া:

১.১৭ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ও ইসরাইলের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্যে পশ্চিম এশিয়ায় ইরানকে কোনঠাসা করার লক্ষ্যে মার্কিন-ইসরাইল-সৌদি অশুভ আঁতাত সর্বক্ষণ তৎপর।

১.১৮ ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দান ও সেখানে দূতাবাস স্থানান্তরের পিছনে রয়েছে প্যালেস্টাইন ভূ-খন্ডে ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরাইলের বেআইনী দখলদারিত্বকে সমর্থন ও জাতিসংঘের প্রস্তাব ও আন্তর্জাতিক মহলের প্যালেস্টাইনের প্রতি ন্যায্য সমর্থনকে অগ্রাহ্য করা। স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র ও পূর্ব-জেরুজালেম তার রাজধানী-এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত্ কিন্তু মার্কিন-ইসরাইল অশুভ অক্ষ একে উপেক্ষা করে তাদের আধিপত্য অব্যাহত রাখছে। ইসরাইল ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যকার সকল শান্তি আলোচনা ভেংগে দেবার পিছনে এই হাত কাজ করে।ডোনাল্ড ট্রাম্প এই এলাকায় নতুন করে সংঘাত, যুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১.১৯ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও মার্কিন হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। এটা আজ সর্বজনবিদিত যে, মার্কিন মদদেই সিরিয়ার আসাদ সরকারকে অপসারণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল যা দীর্ঘ ৬ বছরের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর ব্যর্থ হয়েছে। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী জয়ী হয়েছে। কিন্তু, সে অঞ্চলের নতুন ক্ষমতাবিন্যাসের তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে । সকল ধরণের হস্তক্ষেপ সত্বেও এ অঞ্চলে ইরান তার অবস্থান সংহত করেছে। ইরানের অভ্যন্তরে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর থেকে যে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়, তাতে বাইরে থেকে মার্কিন মদদে সৌদি আরবের হাত আছে। তা সত্বেও এটা ঠিক আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে, দেশের অর্থনীতির সংকট, দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। এ এলাকার সকল প্রগতিশীল মানুষ মনে করে, শান্তি, প্রগতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার হতে পারে ইরানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বহি:শক্তির বিরুদ্ধে সত্যিকারের নিশ্চয়তা। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম দোসর সৌদি আরবকে দিয়ে ইরানকে দূর্বল করার অব্যাহত প্রয়াস, সৌদি আরবকে ইয়েমেনের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে, ইয়েমেন এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। সেখানে শিশু, নারীসহ অসংখ্য সাধারণ আজ মৃত্যু আর দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। মানবাধিকার লংঘন সেখানে আজ এক নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার লংঘনের এই সুস্পষ্ট ঘটনা ঘটছে, অথচ সে ব্যাপারে তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার কোন মাথাব্যথা নেই।

১.২০ ইতিমধ্যে সৌদি আরবের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সৌদি যুবরাজ প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে কাতার, সিরিয়া, ইয়েমেনে সৌদি হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকে। এর সংগে সংগে লেবাননের উপর চলে নতুন করে চাপ প্রয়োগ। হিজবুল্লাহকে দূর্বল করাও এই প্রক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্য।

১.২১ সম্প্রতি তুরস্কের সৌদি দূতাবাসে সৌদি সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী জামাল খাসোগী হত্যা পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্য তৈরী করে। এই ঘটনায় সৌদি যুবরাজের সম্পৃক্ততার প্রমান সৌদি সরকার, এমনকি, খোদ মার্কিন সরকারকে আন্তর্জাতিক চাপ ও সমালোচনার মুখে ফেলে দেয়। এ সকল উদ্যোগই আসলে এ অঞ্চলে মার্কিন-ইসরাইল-সৌদির অশুভ রণনৈতিক পদক্ষেপের অংশ বিশেষ। এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক বিরোধের অন্তরালে রয়েছে শিয়া-সুন্নি বিরোধেরও চক্রান্ত।

১.২২ কাতার আমিরাতকে অবরোধের আওতায় রেখে আঞ্চলিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার সৌদি প্রয়াস প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পায়। এটা সবারই জানা কাতার ও ইরান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র 'সাউথ পারস' (South Pars) এর যৌথ মালিকানা বহন করে। উভয়েরই হাইড্রোকার্বন সেক্টরে সহযোগিতা প্রয়োজন। সৌদি আরব ও ইউনাইটেড আরব আমিরাত চায় কাতারের সরকার পরিবর্তন। এ সকল আঞ্চলিক বিরোধের অন্তর্নিহিত কারণ হলো এ অঞ্চলে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্রদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা।

আফ্রিকা:

১.২৩ ধর্মীয় উগ্রবাদ উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রন করছে সন্দেহ নেই। লিবিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমন ও গাদ্দাফীর পতনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে এক ভয়াবহ অরাজকতা আর অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ আর জংগীবাদকে মোকাবিলা করার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র AFRICOM এর মাধ্যমে তার সামরিক উপস্থিতি শক্তিশালী করেছে। মর্কিন সৈন্যরা সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রক্রিয়ায় নাইজিরিয়া, মালি, সাহেল প্রভৃতি দেশে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালাচ্ছে, যা এ অঞ্চলে উগ্র সন্ত্রাসবাদকেই সে এলাকার জনগণের মধ্যে দৃঢ় অবস্থান তৈরীতে সহায়তা করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ সকল দেশের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর, গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক পথ এবং বাজারের উপর নিয়ন্ত্রন করতে চায়। এ অঞ্চলে চীনের যে কোন প্রভাবকে মোকাবিলা করতে চায়।

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দসমূহ:

১.২৪ পুঁজিবাদের দীর্ঘমেয়াদী সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদের নতুন নতুন আগ্রাসন সাম্রাজবাদী দেশগুলির ঐক্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির নেতৃত্বে বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে বিগত দশকগুলোতে আন্ত:সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ প্রকাশ পায়নি বা সুপ্ত ছিল, তা এখন স্পষ্টত:ই প্রকাশিত হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, ব্রেক্সিট (BREXIT) ভোট এর একটা উদাহরণ। ডোনাল্ড ট্রাম্প গৃহীত বিভিন্ন নীতির সংগে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ যেমন জাপান, ফ্রান্স, জার্মানীসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংগে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ আজ প্রকাশ্যেই চলে এসেছে। আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি নিয়ন্ত্রিত Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) এ জাপানের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরে আসায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ন্যাটোতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বন্ধু মিত্রদের আরও বেশী আর্থিক সংস্থানের দাবী করলে স্বাভাবিকভাবেই তা মতবিরোধের ঘটনা ঘটিয়েছে। সম্প্রতি ইরানের সংগে অনুষ্ঠিত ৬ দেশীয় পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রন চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এককভাবে বেড়িয়ে আসাটা যুক্তরাষ্ট্রের সংগে অন্যান্য স্বাক্ষরকারী দেশ জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মতবিরোধ বৃদ্ধি করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ তার ইউরোপীয় মিত্ররা সমর্থন করেনি। বিশ্ব ফিনান্স পুঁজির আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের আশায় জনগণকে শোষণের ক্ষেত্রে ঐক্য থাকতে পারে, কিন্তু, নিজেদের আন্ত:দেশীয় পুঁজির স্বার্থে দ্বন্দ বেড়িয়ে আসছে।

জলবায়ু পরিবর্তন:

১.২৫ বিশ্ব পুঁজিবাদের মুনাফার লোভে নিয়ন্ত্রনহীন শিল্পায়ন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও ভূ-পরিবেশের জন্য চরম হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে, এটা আজ বিশ্বের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। গোটা পৃথিবী ও সভ্যতাই আজ বিপন্ন। বিজ্ঞান আর বিবেক বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ করছে এক দাবীতে তাহলো, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে রোধ করতে হবে। এই লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর, প্যারিসে 'গ্রীন হাউস গ্যাস' নি:সরণ সীমিত করার যুগান্তকারী মতৈক্যে পৌঁছায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। প্যারিস চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ রোধে এই শতাব্দিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা, এবং এটাকে আরও কমিয়ে ১.৫ ডিগ্রিতে নিয়ে আসার প্রয়াস অব্যাহত রাখা। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তিকে তাদের নিজেদের ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করতে চায়। কার্বন নি:সরণে উন্নত দেশগুলিই যে সবচেয়ে বেশী দায়ী এবং এক্ষেত্রে তাদেরকেই যে বেশী দায়িত্ব নিতে হবে, এ দায় তারা নিতে চায় না। অপেক্ষাকৃত কম কার্বন নি:সরণের প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রযুক্তি সহায়তার দায়ও তারা নিতে চায় না। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্ব উষ্ণায়নে ও ভূ-পরিবেশ ধ্বংসে তাদের যে দায় রয়েছে, সে ব্যাপারে তারা উদাসীন। এর পূর্ববর্তী কিয়োটো প্রটোকলের ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাস্ট্র

একই মনোভাব পোষণ করেছিল। বিশ্ব-পুঁজিবাদের মুনাফার স্বার্থে প্রকৃতি ও পরিবেশকে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গোটা বিশ্ববাসীর । উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির বিশ্ব উষ্ণায়ন ও ভূ-পরিবেশ ধ্বংসের যে কোন প্রয়াসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের আমরা অংশীদার।

বহুমেরু বিশ্ব:

১.২৬ ৯ম কংগ্রেসে এটা উল্লেখ করা হয়েছিল, পুঁজিবাদের বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে, একমেরু বিশ্ব ক্রমাগত বহুমেরু বিশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এই প্রবণতার নানামুখী সংকটও ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ANC-COSATU-SACP ঐক্যের জনপ্রিয়তা হ্রাস এবং ব্রাজিলে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় আসায় BRICS এর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তবুও BRICS সাংহাইতে 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে। BRICS এর সদস্য দেশগুলির এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এর প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কতটা সফলতার সংগে প্রতিযোগিতা করতে পারবে, সেটা একটা চ্যালেঞ্জ।

১.২৭ 'সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন' (SCO) তার আঞ্চলিক ফোরাম সংহত করতে পেরেছে। ভারত ও পাকিস্তান এর সদস্যপদ পেয়েছে। বাংলাদেশ পর্যবেক্ষক হিসেবে আবেদন করেছে। চীন ৬০ সদস্যের একটি 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক' গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

১.২৮ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'একমেরু বিশ্বে'র বৈশ্বিক আধিপত্যের বিপরীতে এ সকল গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামগুলি নি:সন্দেহে একমেরু আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ সকল আঞ্চলিক ফোরামগুলিতে ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারতের বর্তমানের মার্কিন ঘেঁষা বৈদেশিক নীতির প্রবণতা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরী করবে সন্দেহ নেই। চীনের 'এক বেল্ট, এক রাস্তা' (One Belt, One Road) প্রকল্পের উদ্যোগ ভারত সমর্থন করেনি। যদিও বাংলাদেশের মনোভাব ইতিবাচক। এই প্রকল্প প্রাচীনকালের 'সিল্ক রোড' ও 'সামুদ্রিক বাণিজ্যের' ঐতিহ্যকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (World Trade Organization, WTO)

১.২৯ বিশ্ব-বানিজ্য সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১৬২ (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫)। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ যাতে বৈশ্বিক বাণিজ্যে কিছু সমতা পেতে পারে এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক চাপে বাণিজ্য বৈষম্য না তৈরী হয়, তার জন্য কিছু বিধান বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর নীতিমালায় বিধিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু, (WTO) আর এখন বিশ্ব-বাণিজ্য রীতি পালনের মৌলিক ফোরাম নয়। নিজেদের অর্থনৈতিক ও মুনাফাভিত্তিক স্বার্থে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি বিভিন্ন দেশের বা আঞ্চলিক সহযোগিতা তৈরী করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নত মিত্রদেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলি কর্তৃক বিশ্ব ফোরামে উত্থাপিত সকল প্রতিরোধকে উপেক্ষা করতে পারে তাদের দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তির বদৌলতে।

১.৩০ ২০১৭ সালের শেষে বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বুয়েনস আয়ার্স বৈঠকে উন্নত দেশগুলি ই-কমার্স নামে বাণিজ্য উদারিকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করে। তারা দাবী করে ই-কমার্স যে কোন দেশীয় ট্যাক্স মওকুফ পাবে। WTO র গৃহীত এই নীতিমালার ফলে উন্নয়নশীল দেশ ও অনুন্নত দেশগুলোকে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। (WTO) একটি বিশ্ব-ফোরাম হলেও, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো তাকে প্রতিনিয়ত তাদের নিয়ন্ত্রনে ব্যবহার করছে।

সমাজতন্ত্র লক্ষ্যাভিমুখী দেশসমূহ:

চীন

১.৩১ বিগত প্রায় এক দশক ধরে চীন তার গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ অব্যাহত রেখেছে এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধির প্রায় ৩০ শতাংশে চীন অবদান রাখে। বৈশ্বিক পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকটের অভিঘাত চীনকেও প্রভাবিত করে এবং তাকে মোকাবিলা করার জন্যে চীন তার আভ্যন্তরীন চাহিদা

এবং ভোগ তৈরীর উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগ অনেকটা সফল হয়। চীন শ্রমজীবি মানুষের ন্যূনতম মজুরি অব্যাহত ও পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি করেছে। প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে এনেছে। প্রতিনিয়ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নীতিমালা প্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে প্রতি বছর ১৩ মিলিয়ন শহুরে কাজের ধারাবাহিক সুযোগ তৈরী করেছে।

১.৩২ চীনের ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসে চীনা প্যার্টি তাদের দেশে 'চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্র ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চীনা পার্টির নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শি জিন পিং (Xi Jinping) চীনের সমাজতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন এবং এ নতুন যুগকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যুগ হিসেবে অভিহিত করেছেন। চীনা পার্টি কংগ্রেস সংস্কার ও উন্মুক্তকরণের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৈষম্যপূর্ণ ও সীমিত উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করার কৌশল গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দুর্নীতির নেতিবাচক দিকগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হয়েছে ।

ভিয়েতনাম

১.৩৩ ভিয়েতনাম দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এ সময়কালে তাদের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩ শতাংশ। তবুও পার্টির গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা তারা পূরণ করতে পারেনি। বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট ও মন্দার ফলে ২০২০ সালের মধ্যে একটি আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি (CPV) এর ১২তম কংগ্রেসে 'নবায়ন নীতি' অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও হো চি মিনের চিন্তাধারাকে সমন্বিত করে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়াই ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

কিউবা

১.৩৪ কিউবা দশকের পর দশক ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যায্য ও অমানবিক সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে সমুন্নত রেখেছে। কিউবা অব্যাহতভাবে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উদারনীতিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত সকল বামপন্থী, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সার্বিক বিকাশে সর্বতোভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য থেকে কিউবার পার্টি বিচ্যুত হয়নি। কিউবার পার্টি ও রাষ্ট্র অত্যন্ত সফলভাবে নতুন প্রজন্মের হাতে নেতৃত্ব হস্তান্তর করেছে। প্রথমে ফিদেল কাস্ত্রো থেকে রাউল কাস্ত্রো, তারপর মিগুয়্যাল দিয়েজ স্যানেল । কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম কংগ্রেসে দৃঢ়তার সংগে সামাজিক ন্যায্যতা, সমাজতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিউবার সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ভিত্তিতে জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার অর্জন ধরে রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উত্তর কোরিয়া (ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া)

১.৩৫ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সকল ভীতিপ্রদর্শনকে উপেক্ষা করে ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া তার মিসাইল উন্নয়ন প্রকল্প সফল করার মধ্য দিয়ে পারমাণবিক ওয়ারহেড সজ্জিত দেশে পরিণত হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করে, পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়েই কেবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সকল ধরণের অনুপ্রবেশ ও সামরিক আক্রমন মোকাবিলা করা সম্ভব। দশকের পর দশক ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ কোরিয়াকে ব্যবহার করে, এ অঞ্চলে তার সামরিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ ও প্রভাব বজায় রাখতে ছিল বদ্ধপরিকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ায় স্কাড পারমাণবিক মিসাইল স্থাপনা তৈরী করেছে। যার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া এবং চীন উভয়ের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি উভয় কোরিয়ার শীর্ষ নেতৃত্ব দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছে, যা দু'দেশের জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সংগে উত্তর কোরিয়ার শীর্ষনেতা কিম জন উনের দু'দফা বৈঠক হয়েছে। প্রথম বৈঠকে কিছু আশাবাদ তৈরী হলেও, ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত শেষ বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে, এ এলাকার উত্তেজনা অব্যাহত থাকতে পারে।

এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

১.৩৬ ওবামা প্রশাসন তার ক্ষমতার শেষের দিকেই ভূ-রাজনৈতিক সামরিক নীতিতে এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় তাদের নয়া নীতি ঘোষণা করে। সুস্পষ্টভাবে ওবামা ও তাদের পররাষ্ট্র দফতর ঘোষণা করে যে- আগামী দশকগুলোতে

ভূ-রাজনীতির কেন্দ্র হবে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি ও আধিপত্য বজায় রাখায় অব্যাহত প্রচেষ্টা ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের চরম পরাজয়ের পরও এ এলাকায় মার্কিন উপস্থিতি অব্যাহত রাখার জন্য একদিকে ইন্দোচীন, কোরীয় উপকূল, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে গোটা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের যাতে কোন হানি না হয় তার প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে, অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই নয়াকৌশলের কেন্দ্রবিন্দু যে দক্ষিণ চীন সাগরের বিপুল সম্পদের উপর আধিপত্য ও বর্তমানে গড়ে ওঠা চীনের অর্থনেতিক উত্থানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া তা আজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীন ও ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এ এলাকায় তাদের আধিপত্য হাত ছাড়া হবার আশংকায় ফেলেছে। সাম্প্রতিককালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েকটি পদক্ষেপ এই এলাকায় যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। তাইওয়ানকে নতুন করে গুরুত্ব দিয়ে, চীনের সংগে বাণিজ্য লড়াই শুরু করে গোটা অঞ্চলকেই উত্তপ্ত করে তোলা হয়েছে। উত্তর কোরিয়াকে কেন্দ্র করে যুদ্ধংদেহী মার্কিন প্রয়াস মূলতঃ উত্তর কোরিয়ার গতিশীল নেতৃত্বের ফলেই এ এলাকাকে চুড়ান্ত যুদ্ধাবস্থায় ঠেলে দিতে পারেনি। চীনের নেতৃত্বও এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তবে, চীন সমুদ্রে চীনের কৃত্রিম দ্বীপ তৈরীর বিরুদ্ধে অজুহাত তুলে এই এলাকায় ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এমনকি ভিয়েতনামের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ তৈরীর ইন্ধন তৈরী করা হয়েছে। চীন যাতে কোনভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রভাব ফেলতে না পারে সেজন্য ভারতীয় শাসক অর্থাৎ মোদী প্রশাসনকে দিয়ে অব্যাহতভাবে চীনের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা তৈরীর উসকানী দিচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়া:

১.৩৭ দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ব-পুঁজিবাদের বৈশ্বিক রণনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এ অঞ্চলে অবস্থিত সব দেশগুলির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। এ অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িক উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান এ এলাকায় প্রগতিশীল রাজনীতির জন্যে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিও এই অভিঘাতের বাইরে নয়। এটাকে খেয়ালে রেখে রাজনৈতিক পর্যালোচনা করতে হবে।

আফগানিস্তান

১.৩৮ গত শতাব্দির সত্তরের দশকের শেষ থেকে গত প্রায় চার দশক ধরে আফগানিস্তান বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে খালক নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকী দাউদ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশকে ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান ঘোষণা করেন। ১৯৭৯ সালের, ২৭ ডিসেম্বর, সোভিয়েত সমর্থনে পারচাম নেতা বাবরাক কারমাল ক্ষমতায় আসেন। তিনি খালকদেরও সমর্থন পান। তাঁর সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্য প্রেরণ করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের আই এস আই এর মাধ্যমে মুজাহিদিনদের অর্থ ও অস্ত্রের যোগান দিতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে এই সংঘর্ষ দীর্ঘ দশকব্যাপী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। আসলে এ যুদ্ধ বৈশ্বিক দ্বন্দের ভিত্তিতে একটি প্রক্সি যুদ্ধ। হামিদ কারজাইকে অন্তরবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট করে শুরু হয় আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধের আর এক পর্যায়। অদ্যাবধি তা অব্যাহত রয়েছে। আফগানিস্তানের এই গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিঘাত দক্ষিণ এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার উপর পড়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারছে না আবার তালেবানদেরকে সম্পূর্ণ পড়াজিত করতে পারছে না। আফগানিস্তানের এই অস্থিতিশীলতা দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে পাকিস্তানের রাজনীতিকেও অস্থিতিশীল তুলেছে।

পাকিস্তান

১.৩৯ দীর্ঘকাল পাকিস্তানকে রাজনীতির ঘুঁটিতে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের জনগণের কাছেও ধিকৃত। কিন্তু পাকিস্তানে চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদের উত্থান আজ পাকিস্তানকেই অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ওবামা আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণার পর থেকে সেখানকার মৌলবাদী শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখানে শক্তিবৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। তার ফলে পাকিস্তানে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। পাকিস্তান জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক শক্তির পর্যবেক্ষণে আলোচনার মাধ্যমে আফগান সমস্যার সমাধান চেয়েছে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে নেওয়াজ শরীফ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের পর পাকিস্তানের সামরিক

বাহিনীর মদদপুষ্ট হয়ে ইমরান খানের ক্ষমতায় আসা সে দেশের দক্ষিণপন্থার বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে। তার অভিঘাত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও পড়বে। সে দেশের শাসকগোষ্ঠী ভারত বিরোধীতার ট্রাম্প দিয়ে দশকের পর দশক ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। সম্প্রতি কাশ্মীর সীমান্তে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, ভারতের সেনাদলের উপর আত্মঘাতি হামলায় প্রায় ৪০ জন সৈন্যের মৃত্যুর পর ভারতের বিমান হামলা, একজন বৈমানিকের পাকিস্তানের হাতে ধরা পড়া, তাকে ফেরৎ পাঠানো প্রভৃতি নাটকীয় ঘটনা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে সন্দেহ নেই।

ভারত

১.৪০ ভারতে আজ সর্বব্যাপী দক্ষিণপন্থী, চরম সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটেছে। এর ফলে, সে দেশের গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তি আজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। এই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের মতো দীর্ঘকাল স্থায়ী বামপন্থী প্রভাবকে কোনঠাসা করে ফেলেছে। ভারতে ১১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, সম্প্রতি কাশ্মীর সীমান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনা, এই লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে। বি জে পি-আর এস এস হিন্দুত্ববাদের শ্লোগান তুলেছে। গত ৪ বছরে মোদি সরকারের গৃহীত নীতিমালা শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু তা বি জে পি বিরোধী ভোটে রূপান্তরিত হতে পারেনি, বরং বিগত লোকসভা নির্বাচনে (২০১৯) বি জে পির নেতৃত্বে গোটা ভারতে চরম সাম্প্রদায়িক শক্তি ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করেছে। পশ্চিম বাংলা ও আসামসহ গোটা ভারতেই ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক শক্তির এই বিপর্যয় শুধু ভারতের নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক শক্তির জন্য অশনিসংকেত। ভারতের এই নির্বাচনী ফলাফল দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে তথা বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

১.৪১ বাংলাদেশের সংগে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীল। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ বাংলাদেশের জনগণকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও '৭১ মুক্তিবাহিনীর সংগে একসংগে লড়াই করেছে, রক্ত দিয়েছে।ফলে, উভয়দেশের জনগণের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাতিক বন্ধন। কিন্তু, আন্ত:রাষ্ট্রীয় অনেক ইস্যুতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের মতপার্থক্যও আছে। ফলে, উভয় দেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। তিস্তার পানি বন্টনসহ আন্ত:দেশীয় নদী সমস্যা, মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিংগা স্মরণার্থী বিষয়ে ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের পক্ষে যায় না। এ ছাড়া রয়েছে বাণিজ্য ঘাটতির মত অর্থনৈতিক ইস্যু, সীমান্তে বেআইনী অনুপ্রবেশের ঘটনায় বেসামরিক মানুষ হত্যা প্রভৃতি। ফলে, উভয় দেশের রাজনীতিতেই তাই রয়েছে স্পর্শকাতরতা।

নেপাল

১.৪২ বামপন্থীদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নানা রাজনৈতিক অস্থিরতার ও অনিশ্চয়তার পর নেপালে সংবিধান গৃহীত হয়, যার ভিত্তিতে, ২০১৭ সালের নভেম্বরে নির্বাচনে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় যাওয়া দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের জন্য এক ইতিবাচক মাত্রা তৈরি করেছে। উপরন্তু, নেপালের দু'টি প্রধান কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত শুধু সে দেশের জনগণ নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন উদাহরণ স্থাপন তরেছে। তবে, এখানেও ভারতীয় শাসকরা তাদের প্রভাব হারিয়ে নতুন করে তাদের প্রভাব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট রয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ইউরোপীয় মিত্ররা নেপালে তাদের তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে, এমনকি নেপালের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করছে। নেপালের সংগে চীনের সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।ফলে, এখানকার কমিউনিষ্টদের সামনে রয়েছে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

শ্রীলংকা

১.৪৩ ২৬ অক্টোবর, ২০১৮ প্রেসিডেন্টের UPFA র সাংসদরা রনিলে বিক্রমসিংহের জাতীয় সরকার ত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট সিরিসেনা প্রধানমন্ত্রী রনিলে বিক্রমসিংহকে বরখাস্ত করে পূর্বতন প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন।

রনিল বিক্রমসিংহে এ নিয়োগ উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে অস্বীকার করেন। কয়েকদিনের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দেশের সুপ্রীম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সুপ্রীম কোর্ট প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে অসাংবিধানিক রায় দেয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাজাপাকসের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট দেয়। ১৬ ডিসেম্বর, বিক্রমসিংহে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। আপাতত: সংকট নিরসন হয়।

১.৪৪ শ্রীলংকার সাম্প্রতিক অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন দীর্ঘ কয়েক দশকের আভ্যন্তরীন রাজনীতির নানা অভিঘাতের ফলশ্রুতি, তেমনি আন্তর্জাতিক শক্তিবলয়েরও স্বার্থের টানাপোড়েনের প্রভাব। এবং তা কখনই এই এলাকার ভূ-রাজনীতির বাইরে নয়।

মালদ্বীপ

১.৪৫ মালদ্বীপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সে দেশের আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক দ্বন্দের যেমন বহি:প্রকাশ তেমনি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন-ভারত সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক শক্তির দ্বন্দেরও বহি:প্রকাশ। দক্ষিণ এশিয়ায় এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো মালদ্বীপের ভূ-রণনৈতিক গুরুত্ব এবং সেখানে চীন না ভারত কার প্রভাব বেশী হচ্ছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ী প্রেসিডেন্ট মুহামেদ সলিহ, পূর্বতন প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিন চীনের সংগে যে অর্থনৈতিক লেনদেন করেছে, তার পর্যালোচনা করার ঘোষণা দিয়েছে। পাশাপাশি, ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যকার প্রতিরক্ষা সমঝোতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংগে মতবিনিময় করেছে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, আবদুল্লাহ ইয়ামিনের সময়ে মালদ্বীপের তৎকালীন সরকারের সংগে চীনের যে ঘনিষ্টতা তৈরী হয়েছিল, বর্তমান প্রেসিডেন্ট মোহামেদ সলিহের সময়ে ততটা থাকছে না। ফলে, স্পষ্টত:ই ভারত মহাসাগরীয় এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি ঘিরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলির প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ভারতের সংগে ভারতের এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাকে হাতিয়ার করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একে তার এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণনৈতিক কৌশলের সংগে যুক্ত করবে সন্দেহ নেই।

মায়ানমার

১.৪৬ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে মায়ানমারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা তাদের অবস্থান দৃঢ় করতে সচেষ্ট রয়েছে-কিছুটা সফলও হয়েছে। সূ কি সরকার পশ্চিম ঘেঁষা এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, চীন ও ভারতেরও মায়ানমার অর্থনীতিতে প্রচুর বিনিয়োগ থাকায় মায়ানমারের সংগে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। আভ্যন্তরীন রাজনীতির ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল সামরিক জান্তা বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেও সামরিক সরকারের সংগে আঁতাত করে ক্ষমতায় গিয়ে সু কী সরকার যে কতকগুলো জটিল সমস্যার সম্মুখীন, তাতে বিশ্বব্যাপী তাঁর ভাবমূর্তিকে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারমধ্যে মুসলিম রোহিংগা সমস্যা প্রধান। মুসলিম রোহিঙ্গাদের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সংগে সংশ্লিষ্টতা আছে এই দাবীতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর মৌলবাদী বৌদ্ধদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, সংগে সামরিক বাহিনীর অভিযান এর ফলে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিংগা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এই রোহিঙ্গা অভিবাসী সমস্যা বাংলাদেশের এক স্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিশেষ করে কক্সবাজার অঞ্চলে তাদের অবস্থান স্থায়ী সংকটের সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে জামাতসহ মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। রোহিঙ্গা সমস্যা মায়ানমারের সংগে দীর্ঘস্থায়ী কূটনৈতিক সমস্যা। এর ফলে মায়ানমারের সংগে আন্তঃদেশীয় উন্নয়ন ও সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য, রোহিংগা প্রশ্ন সমাধানে রাশিয়া, চীন ও ভারতের ভূমিকা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত নয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় উগ্র-সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী শক্তির বিপদ:

১.৪৭ পার্টি ৯ম কংগ্রেসেই সুস্পষ্টভাবে দক্ষিণ-এশিয়ায় উগ্র-সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী শক্তির বিপদ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব ও সতর্ক করেছিল। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে কয়েক দশক ধরেই উগ্র দক্ষিণপন্থী ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তি সে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধকেই ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ভারতে পর পর দু'টি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী শক্তির ভূমিধ্বস বিজয়, সে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণে। সাম্প্রতিককালে, শ্রীলংকায় গির্জায় প্রাণঘাতি বোমা হামলা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা সে দেশেও উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপদকেই নির্দেশ করে। এমনকি, নেপালে

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামপন্থীরা নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় গেলেও দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি সেখানেও তৎপর। বাংলাদেশে এই বিপদ সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো, যে কোন সুযোগে তা বেড়িয়ে আসবে। ১০ম কংগ্রেস দক্ষিণ-এশিয়ায় **উগ্র-সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী শক্তির বিপদ কে** এ অঞ্চলের রাজনীতির বিশেষ নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ

১.৪৮ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্র। তাই, দক্ষিণ এশিয়ার পারিপার্শ্বিক দেশগুলির রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা এশিয়-প্রশান্ত অঞ্চলে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত করার জন্য বাংলাদেশে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশেষ করে এখানে চীনের যেকোন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাব তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সংগে রাশিয়া ও চীনের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বেপরোয়া করে তুলেছে। ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তাদের জুনিয়ার পার্টনার সন্দেহ নেই, কিন্তু, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাদের দ্বন্দ ও ঐক্যের সম্পর্ক। বাংলাদেশের সংগে ভারতের সুসম্পর্ক ভারতের আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত স্বার্থেই প্রয়োজন। চীনের সংগে বাংলাদেশের কোন ঘনিষ্টতা তারা চাইবে না। সেক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্রের সংগে তার ঐক্য আছে। কিন্তু, বাংলাদেশের মধ্যে কোন শক্তি পাকিস্তানের সংগে ঘনিষ্ট হবে,তা ভারত চাইবে না। কিন্তু, যেহেতু, ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সংগে ঘনিষ্ট, সেহেতু, এক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্রের সংগে ভারতের অনৈক্য। পাকিস্তানও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিরন্তর ভূমিকা রাখার চেষ্টা রেখে চলে। বাংলাদেশ কার্যতঃ বড় অর্থনৈতিক বাজার, সস্তাশ্রমের উৎস এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকেন্দ্র এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদও অন্যতম আকর্ষণের বিষয়। বাংলাদেশ তাই বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক শক্তির আগ্রহের ক্ষেত্র।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রস্তাব:

১.৪৯ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রণনৈতিক, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে সাম্রাজ্যবাদের সকল প্রকার হস্তক্ষেপ, অনুপ্রবেশ ও প্রভাবের তীব্র বিরোধীতা করে।

১.৫০ পার্টি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় প্ররোচনায় সংঘটিত সকল ধরণের সন্ত্রাসের বিরোধীতা করে।

১.৫১ পার্টি আন্তর্জাতিকভাবে নয়া-উদারতাবাদ, নয়া-ফ্যাসিবাদ, মৌলবাদ, ধর্মীয় উগ্রতাবাদ, রহস্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে তার দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করে।

১.৫২ পার্টি মার্কিন-ইসরাইল-সৌদি অশুভ অক্ষের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইন জনগণের ন্যায্য সংগ্রামসহ মধ্যপ্রাচ্যেও সকল ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সংহতি প্রকাশ করে।

১.৫৩ পার্টি বিশ্বব্যাপী সকল বাম-প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা শক্তিগুলিকে সমর্থন করে এবং আরও আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার অব্যাহত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে দৃঢ় সমর্থন করে।

১.৫৪ চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, উত্তর কোরিয়া ও লাওসের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণ ও পার্টির সমাজতন্ত্র বিনির্মানের সংগ্রামকে পার্টি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

১.৫৫ পার্টি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উদারনীতিবাদ বিরোধী সকল লড়াই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্রদের যে কোন অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী সকল ধরণের সংগ্রামকে সংহত করার কাজকে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে।

২. জাতীয় পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিঃ সাধারণ চিত্র

২.১ ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতির বিবেচনায় এই নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ জরুরী। কারণ ঐ নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি দেশের রাজনীতির গতিমুখ নির্দিষ্ট করবে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যে নেতিবাচক ধারণা তৈরী হয়েছে এবং তার অল্প পরে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যা আরও পরিপুষ্ট হয়েছে তা এদেশের রাজনীতি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য একটি অশনি সংকেত। ভবিষ্যতে পার্টি কোন পথ গ্রহণ করবে এই নির্বাচনের পর্যালোচনা তার অন্যতম উপাদান।

২.২ ৯ম কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের পূর্বে দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চৌদ্দদল ও মহাজোট ছাড়া বিএনপি-জামাত জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাতে অংশ নেয়নি। বরং বিএনপি-জামাত জোট নির্বাচনের পূর্ববর্তী তিন মাস ও নির্বাচনের দিন সমস্ত দেশে এক চরম অরাজক পরিস্থিতি তৈরী করে ঐ নির্বাচন বানচালের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নেয়। সংবিধানিক ধারাবহিকতা রক্ষার জন্য পার্টি ১৪ দলের অংশ হিসাবে ঐ নির্বাচনে অংশ নেয়। এমনকি নির্বাচনকালীন মন্ত্রীসভায়ও যোগ দেয়।

২.৩ ৯ম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে ঐ নির্বাচন সম্পর্কিত পার্টির পলিটব্যুরোর মুল্যায়ন উল্লেখ করে বলা হয় "সকলের অংশগ্রহণ নিয়ে নির্বাচনটি হলে তা হোত সর্বোত্তম। কিন্তু বিরোধী জোটের সুনির্দিষ্ট টার্গেট অর্জনের জন্য যখন তারা ভোট বানচাল করতে চেয়েছে, জনগণ ও রাষ্ট্রের উপর আক্রমন পরিচালনা করেছে তখন বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে যে ভোট হয়েছে তার ন্যায্যতা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে ১৫৩ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাওয়া, এরশাদের বিশ্বাসহীনতা ও বিভ্রান্তিকর আচরণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে পরিছন্ন রাজনীতিক সাংগঠনিক উদ্যোগ না থাকা ভোটের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ভোটের আইনী ভিত্তি থাকলেও গ্রহণ যোগ্যতার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে উল্টো দিকটিও দেখা দরকার। গ্রহণ যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে দেশের তথাকথিত সুশীল সমাজ, বিদেশী কূটনৈতিক মিশন, বিশেষভাবে পাকিস্তান ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন প্রতিনিধি ডান মজিনা যে ভূমিকা নিয়েছে তা বিএনপি-জামাতকে পরোক্ষভাবে রক্ষা করেছে।"

২.৪ ৯ম কংগ্রেস পরবর্তীকালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ছিল বিরোধী বিএনপি-জামাত জোটের প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা দ্রুতই তার ক্ষমতাকে সংহত করেন এবং বিএনপি-জামাত জোট নির্বাচনকালীন সময় তাদের অবিমৃষ্যকারী পদক্ষেপের জন্য জনগণ থেকে বেশ ভালভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা ঐ নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন ধরণের কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। তাদের কর্মীরা ক্রমেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইন্টারপার্লামেন্টারী ইউনিয়ন (আইপিইউ) ও কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশনে (সিপিএ) সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় দশম জাতীয় সংসদ যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২.৫ জাতীয় ক্ষেত্রে সরকার ও সংসদের সংহত অবস্থান ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বাভাবিকভাবে শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সরকার জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নকে মুখ্য বিষয় হিসাবে সামনে নিয়ে আসে। সরকারের তরফ থেকে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতার বাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বন্দর, কর্নফুলী নদীতে টানেলসহ দশটির বেশী মেগা প্রকল্প বস্তবায়ন করা শুরু হয়। দেশে ১০০টির বেশী অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা উল্লম্ফন ঘটে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি শতকরা ছয়ের ঘর অতিক্রম করে শতকরা সাতের ঘরে প্রবেশ করে। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৫২ ডলারে (বর্তমানে ১৯০৯ ডলার)। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কারণে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ ও অতিদরিদ্রের সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগে নেমে আসে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মন্দা বাংলাদেশের সামস্টিক অর্থনীতিতে খুব একটি প্রভাব ফেলতে পারেনি। মুদ্রাস্ফীতি ও ৫.৫% এর কাছাকাছি ছিল। ২০১৭ সালের মার্চে বাংলাদেশ স্বাল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে আসে।

২.৬ দেশের এই অর্থনীতিক অগ্রগতি সরকারকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সরকার বিভিন্ন স্তরের আন্তর্জাতিক সমীক্ষার ও বিশ্লেষণের সূত্র ধরে দেশকে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে দাবী করে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জন্য এ ধরণের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নি:সন্দেহে উৎসাহ ব্যঞ্জক। কিন্তু যে বিষয়টি সরকার ও সরকারী কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে গেছে অথবা যা তারা স্বীকার করতে চান না যে, যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে এবং ঘটছে তা শ্রমিক-কৃষকসহ শ্রমজীবি ও নিম্ন আয়ের মানুষকে বাদ রেখেই যা টেকসই উন্নয়নের বিপরীত। 'জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' যাতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর দাতা দেশ-তাতে বলা আছে 'কাউকে বাদ দিয়ে রাখা যাবেনা' ('Nobody is to be left behind') সেখানে দেশের বৃহদাংশ মানুষ এই উন্নয়নের বাইরে থেকে যাচ্ছে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে লাগামহীনভাবে। সকল বেসরকারি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এখনো নির্ধারিত হয়নি। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষিত হয়েছে যা জীবন যাত্রার প্রয়োজন বিবেচনায় কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। বেসরকারিও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প শ্রমিকদের বেতন কিছু বাড়লেও বেতনভাতার অনিশ্চয়তা, বকেয়া গ্রাচ্যুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড বছরের পর বছর পরিশোধ না করায় শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে। প্রায়শঃই বিক্ষোভ করেছে তারা।

২.৭ শিক্ষা ক্ষেত্রে অস্থিরতা, উচ্চ শিক্ষায় সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষের সন্তানদের সুযোগের অভাব, হেফাজতের কাছে নতজানু হয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কারিক্যুলামে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপোষ, কাওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে চরম নৈরাজ্য। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরে লিঙ্গ বৈষম্য প্রায় দূর হওয়া। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও দুর্নীতির পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরেই তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা বলা হলেও দুদক একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি দমন আইনের সংশোধন করে তাকে নখ দন্তহীন করে দেয়া হয়েছে।

২.৮ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশেষ বিশেষভাবে প্রশংসিত হলেও নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, খুন, অপহরণ দ্রুত মাত্রায় বেড়ে চলছে। বেড়ে চলছে শিশুর প্রতি সহিংসতা, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা।

২.৯ জামাতকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে কোনঠাসা করা গেলেও সমাজে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক ভাবনার বিস্তৃতি ঘটেছে। জঙ্গিবাদকে নিয়ন্ত্রনে আনা গেলেও ধর্মীয় উগ্রবাদ, পর-ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও সহিংসতারই বিস্তৃতি ঘটছে।

২.১০ আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে দেয়া হয়েছে বিপুল ক্ষমতা। গুম, হত্যা, ক্রসফায়ার, এসবের সাথে আইন শৃংখলা বাহিনীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ক্রমেই বেড়েই চলছে। সড়কে কোনপ্রকার শৃংখলা নাই। মানা হচ্ছেনা বিল্ডিং কোড, ফায়ার সেফটি নির্দেশনাবলী। ফলে সড়ক দুর্ঘটনা, বিল্ডিং ধ্বসে, আগুন লেগে নিয়মিত মৃত্যু ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটছে।এই সময়কালে এই সাথে যুক্ত হয়েছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর ব্যাপক দলবাজী, দলীয় সংকীর্ণতা, দখলদারী, লুট ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। ফলে জনমনে সৃষ্টি হয়েছে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার। প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব। ফলে কোন ইতিবাচক ও উন্নয়নমুখী কাজও যথাযথভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারছেনা।

২.১১ গণতান্ত্রিক মত ও পথ প্রকাশের ক্ষেত্রও সংকুচিত হয়ে আসছে। ডিজিটাল নিয়ন্ত্রন আইন, টেলিফোনে আড়িপাতা আইন প্রভৃতি ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরও চরম আঘাত হানছে। এ সব মিলিয়ে দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২.১২ এরই প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই নির্বাচনকে অন্তর্ভূক্তিমূলক করার জন্য সরকার নিজেই যেমন আগ্রহী ছিল, বিদেশী বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক মিশন ও সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকেও সরকারের উপর চাপ ছিল। এ কারণে-সরকার সবসময়ই বিএনপি-বিরোধী জোটসহ সকল রাজনৈতিকদলকে নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছে। অবশ্য যে কারণে পঞ্চম সংশোধনীতে বাতিলকৃত তত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান, অথবা নির্বাচনের পূর্বে শেখ হাসিনার

পদত্যাগ-বিরোধীদের এ ধরণের অযৌক্তিক দাবী সরকার ও আওয়ামী লীগ কোনভাবেই মানতে রাজি ছিলেন না। এটা তারা বার বারই স্পষ্ট করে বলেছে। কিন্তু বিরোধী বিএনপি-জামাত বিশদলীয় জোট তাদের দাবী পুরণ না হলে নির্বাচনে যাবেনা বলে হুংকার দিতে থাকে। অবশ্য তাদের ঐ দাবীতে কোন কার্যকর আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারেনি। এমনকি বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতির দায়ে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারারুদ্ধ হলেও সে দাবীতেও তারা রাস্তায় নামতে পারেনি। একদিকে বেগম জিয়ার কারাদন্ড ও অন্যদিকে তারেক জিয়ার লন্ডনে পালাতক জীবন-বিএনপিকে নেতৃত্বহীন করে দেয়। যুদ্ধাপরাধের দায়ে নেতাদের ফাঁসী জামাতকেও রাজনৈতিক-সংগঠনিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। দলের নেতা কর্মীদের উপর পুলিশের জুলুম, মামলা, হামলা, গ্রেফতারকে আন্দোলন না করতে পারার কারণ হিসেবে বিএনপি নেতৃত্ব উল্লেখ করলেও আসলে নৈতিকভাবেই তারা দূর্বল হয়ে পরেছিল। এই অবস্থায় দেশী-বিদেশে শক্তির সহায়তায় ড. কামাল হোসেনকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। এই জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সাধারণভাবে কিছু আশায় জাগ্রত করলেও ঐক্যফ্রন্টের জামাত সংশ্লিষ্টতা, নেতৃত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও সিদ্ধান্তহীনতা অচিরেই তাদের সম্পর্কে জনগণের আস্থাবোধের অবসান হয়। সবশেষে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সরকারের সাথে তাদের সংলাপের আহ্বানের রাজনৈতিক কৌশলেও তারা পরাজিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্জলদী ঐক্যফ্রন্টের ঐ সংলাপের আহ্বানকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরসহ সকল স্তরের রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ সংলাপকে লঘু করে দেন। ঐক্যফ্রন্ট সংলাপে যোগ দিয়ে তাদের কথা বললেও শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন করার প্রশ্ন নিয়ে চরম দোদুল্যমানতার পরিচয় দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐক্যফ্রন্ট ও বিএনপি শেখ হাসিনার সরকারের অধীনেই নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধন্ত নেয়। কিন্তু তারা ঐ নির্বাচনে কিভাবে অংশ নেবে তার কোন কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে পারেনি। ঐক্যফ্রন্ট এতদিন এদের সাথে জামাতের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবী করলেও নির্বাচনী মনোনয়নে দেখা যায় জামাতের প্রার্থীরা বিএনপির ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করছে। অন্যদিকে বিএনপি নেতা লন্ডনে পলাতক তারেক জিয়া ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রার্থী মনোনয়ন দেন। জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে চরম নির্বাচন বানিজ্য হয়েছে। যার ফলে বিএনপির প্রার্থী সকালে একজন বিকালে আরেকজন হয়েছে। নির্বাচনে এমন প্রার্থীদের মানোনয়ন দেয়া হয়েছে যাদেকে কেউ বিশেষ চেনে না। প্রার্থীদের নিজ এলাকা থেকে সরিয়ে অন্য এলাকায় মনোনয়ন দেয়া হয়। এর ফলে আন্দোলন নিয়ে হতাশ বিএনপির নেতা কর্মীরা নির্বাচন নিয়েও হতাশ হয়ে পড়ে। নির্বাচন শুরু হলে তাদের, এমনকি প্রার্থীদেরও নির্বাচনী প্রচারকাজে বিশেষ দেখা যায়নি। বিএনপি দলগতভাবে ছিল প্রায় দিক-নির্দেশনাহীন, অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত। পুলিশ ও প্রশাসনের বিরোধীতার মুখে কিভাবে ভোটারের কাছে যাওয়া যাবে এবং তাদের মধ্যে ভরসার জায়গা তৈরি করা যাবে, দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতীত সব জায়গাতেই তারা ব্যর্থ এবং অকার্যকর হয়েছে। কার্যতঃ হারার আগেই হারার মানসিকতা নিয়ে তারা নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচন প্রতিরোধ বা বানচাল করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার, নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়েই তারা এগিয়েছে।

২.১৩ পক্ষান্তরে ১৪ দল তথা আওয়ামী লীগ, 'অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারা ও উন্নয়ণকে অব্যাহত রাখার নির্বাচনী শ্লোগান নিয়ে সংগঠিতভাবে প্রচার প্রচারণায় অংশ নেয়। বিএনপি-জামাত নেতা নেতিবাচক রাজনীতি ও বিএনপি-জামাত জোটের দুঃশাসনের সময়ের ঘটনাবলী ১৪ দলের নির্বাচনী প্রচারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। ঐ প্রচারে তারা এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় যে, দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার কোন বিকল্প নাই।

২.১৪ এটা সত্য যে আওয়ামী লীগের দশ বছরের শাসনের যে নেতিবাচক দিকগুলি কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশেষ করে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ এর নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন থাকায় সাধারণ ভোটাররা আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দলের প্রতি বিরূপ ছিল। দশ বছরের ক্ষমতা থাকার কারণে নির্বাচনের anti-incumbency factors বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু বিরোধী কোন বিকল্প না থাকায় তাদের কাছে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তা ছাড়া জনগণ দশ বছরে যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে, বিশেষ করে মৌলবাদী জঙ্গিবাদী উত্থান, মাদক, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকার যে দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছে তাতে তার প্রতি ক্রমাগত আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া তারা অবস্থিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বিশেষ আগ্রহী ছিল এই অবস্থায় আঠারো সাল এলে, এটা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে জনগণ আরেকবার শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে

চায়। দেশীয় ও আন্তজার্তিক বিভিন্ন জরীপে দেখা যায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দল আবার ক্ষমতায় ফিরে আসছে। তবে তাদের আসন সংখ্যা কিছুটা কমতে পারে।

২.১৫ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশও একই ভাবে শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনাকেই তাদের জন্য সুবিধাজনক মনে করেছে। অতীতের বিভিন্ন নির্বাচনে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভেদ থাকলেও এবার তারা এককাট্টা হিসাবে কাজ করেছে। তাদের মধ্যে বরং প্রতিযোগিতা ছিল কে কতবেশী ভাবে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

২.১৬ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাষ্ট্রযন্ত্রের এই অবস্থান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে বিএনপি-জামাত বিরোধী ঐক্যফ্রন্টের ভঙ্গুর ভূমিকায় আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে আসা মোটামুটি নিশ্চিত হলেও তারা জনগণের উপর আস্থা রাখতে পারেনি। বরং তারা জোর করে জেতার লাইনে যাবার মানসিকতায় ভুগেছে এবং তার উপরই জোর দিয়েছে। এটা যে তাদের রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দিচ্ছে সেটা তারা আমলেই নেয়নি। নির্বাচনের মাঠে বিরোধী দলের কার্যতঃ অনুপস্থিতি, আওয়ামী লীগ দলের এ ধরণের মনোভাব ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থান সব মিলিয়ে নির্বাচনে জনগণ তথা ভোটারদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে।

২.১৭ এ দেশের জনগণ ভোটকে উৎসব হিসেবে নেয়। এবারও জনমনে সে ধরণের একটি মনোভাব কাজ করছিল। সে কারণে নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই অনেক জায়গায় প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা সারিবদ্ধভাবে ভোট দেয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানতে পারে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরও ভোট দেয়া হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও ব্যালট পেপারের অভাবে ভোট বন্ধ হয়ে যায়। আর প্রতিপক্ষের কোন এজেন্ট বা কর্মী না থাকায় দেদারছে জাল ভোট দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভোটারদের পরিচিতি পেলে তাদের ভোট দিতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগও ওঠে। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত হচ্ছে জেনে নির্বাচনী কর্মকর্তারাও এসব কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যালোচনায় ভোটের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, সারাদেশে ব্যাপক ভোটের কারচুপি হয়েছে এবং এটা করা হয়েছে প্রধানতঃ প্রশাসনকে ব্যবহার করে এবং তাদের সক্রিয় সহায়তায়। বিভিন্ন এলাকায় ভোটের আগের রাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটের বাক্স পূরণ করার অভিযোগ উঠেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কশিনারদের বক্তব্যেও এর স্বীকৃতি মিলেছে।

২.১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। নির্বাচন কমিশন ভোটের অনিয়ম প্রতিরোধে তাকে দেয়া ক্ষমতার সামান্যতম ব্যবহার করেনি। তাদের ভূমিকা এ ধরণের একটি নির্বাচনের পক্ষেই ছিল। বরং যেখানে এ ধরণের নির্বাচন নিয়ে জনমন বিশেষ করে ভোটারদের মধ্যে ক্ষুব্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। একাদশ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নির্বাচনের মূল্যায়ন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বিভাজন আছে তা একজন কমিশনারের প্রকাশ্য বক্তব্যে স্পষ্ট। এর ফলে নির্বাচন কমিশন যেমন ভোটারদের কাছে তেমনি নির্বাচনী কর্মকর্তা বিশেষ করে প্রশাসনের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকখানি হারিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপরই অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ করার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন বারবার ঘোষণা করলেও এবং বেশ কিছু জায়গায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা, ভোটের প্রচারণায় অংশ নেয়ার কারণে কিছু নির্বাচনী এলাকা থেকে এমপিদের এলাকা ত্যাগের নির্দেশ প্রদান, নির্বাচনী ও পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারসহ তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া– এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও জনগণ ভোট দিতে আসেনি। নির্বাচনী বুথ খালি ছিল। নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইনশৃংখলা বাহিনী স্থান ভেদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে পক্ষ নিয়েছে এবং যেটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক তা'হল ভোটার উপস্থিতি না হওয়ার পরও ভোটের পার্সেন্টেজ বৃদ্ধি করার জন্য বিজয়ী প্রার্থীর পক্ষে ভোট কেটে বাক্স ভরার ঘটনা। এ ক্ষেত্রে তারা নির্বাচন কমিশনের কোন অনুশাসনই মানেনি এবং নির্বাচন কমিশনও লোক দেখানো কিছু ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া সে ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিল বলে প্রতীয়মান হয়নি। ফলে সামগ্রিক নির্বাচন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণ সম্পূর্ণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এবং এ ব্যাপারে জনমনে এক চরম নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। দশম কংগ্রেস মনে করে জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন এবং তদপরবর্তী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় জনমনে যে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। এর ফলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী আচরণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। জনগণ নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রই ক্ষমতার

নিয়ামক হবে। এই অবস্থায় জনগণ, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সবই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। যে বাংলাদেশের জন্ম জনগণের ভোটের রায় প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান আমল তো বটেই, বাংলাদেশ আমলেও সকল কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভোটের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে তা এভাবে বিনষ্ট হতে দেয়া যায় না। দশম কংগ্রেস মনে করে নির্বাচনকে তার স্ব-মর্যাদায় ফিরিয়ে আনা, ভোট প্রয়োগের অধিকার নিশ্চিত করা, নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এসব প্রশ্ন মুখ্য হয়ে সামনে এসেছে। পার্টিকে এই সংগ্রামে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

২.১৯ নির্বাচনের এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সমস্ত নির্বাচন, সংসদ ও সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিন্তু, তাই বলে নির্বাচন বর্জনও কোন যথাযথ কৌশল নয়। বরং ধৈর্য্য ধরে এই সংগ্রাম করতে হবে। এটা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন লড়াই নয়, সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে এটা যুক্ত। দীর্ঘ সময় ধরে অনুসৃত দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ও সাম্প্রদায়িক ধারার প্রচলন রয়েছে তাকে উৎখাত করে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক ধারাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে সে ক্ষেত্রে পার্টির সুস্পষ্ট অবস্থান যে গণতান্ত্রিক ধারাকে পরিপুষ্ট করেই উন্নয়নকে টেকসই করা যাবে। না'হলে ঐ উন্নয়ন কেবল মুখ থুবড়ে পড়বে না, দুষ্ট চক্রের হাতে পরিপূর্ণভাবে বন্দী হবে। গণতন্ত্র, নির্বাচন ও শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে জনগণের আস্থাবোধ ফিরিয়ে আনা, তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় করা এটাই পার্টির সামনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। দশম কংগ্রেস সেই দিকে পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

২.২০ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার ২১ দফা কর্মসূচী এবং ১৩ টি লক্ষ্য নিয়ে পার্টি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। সাধারণ বিবেচনায়, রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার আলোকে পার্টির রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা সঠিক ছিল। কিন্তু, এটা অনস্বীকার্য, নির্বাচনের সাংগাঠনিক পরিকল্পনায় দূর্বলতা ছিল । নির্বাচনকে মৌসুমী কাজ না ধরে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা নিয়ে, জনগণের মধ্যে নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলে, মুখ্যতঃ নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে নির্বাচন করার মানসিকতার ব্যাপক ঘাটতি ছিল। ২/১ টি এলাকায় পার্টি কমরেডরা লেগে পড়ে থেকে এলাকা তৈরী করলেও পার্টির বার্গেনিংএর দূর্বলতায় তা জোটের সামনে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত হয়নি, এমনকি, পার্টিতেও প্রায়োরিটি নির্ধারিত হয়নি। অনেক তাগাদা উদ্যোগ নেবার পর একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছিল। দলীয় মনোনয়ন পেয়ে প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণায় নেমেছিল। কিন্তু, একদিকে নিজের পার্টি সংগঠনের উপরে দাঁড়ানোর চেয়ে আওয়ামী লীগের উপর নির্ভরতার দিকটা প্রধান ছিল। অন্যদিকে, জোটে নিজেদের প্রার্থী নির্ধারণে এবং জোটের মধ্যে দরকষাকষিতেও দূর্বলতা ছিল। জোট বিবেচনায় কোন কোন প্রার্থীকে প্রাধান্য দেবে, তা পার্টিতে সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত হয়নি। জোটগতভাবে প্রার্থীতা পাবার ক্ষেত্রে পার্টির কোন প্রার্থী অধিকতর সুবিধা পাবে, সেটা পার্টির হাতে থাকেনি, জোটের প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও তার নেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছার উপর তা নির্ভরশীল ছিল। আওয়ামী লীগ যে দলগতভাবে জোটের শরীকদের শক্তি খর্ব করার পরিকল্পনা করছে, তা ভালভাবে অনুধাবন করা হয়নি, হলেও সে মোতাবেক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কোন প্রার্থীকে জোটে দিলে তারা জিতে আসতে পারেন তার হিসেবেও ভুল ছিল। তবে পার্টির কর্মীরা রাজনৈতিকভাবে, সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ঢাকা, রাজশাহী ও সাতক্ষীরা এই তিনটি আসনে, পার্টির প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন, সেখানে প্রার্থীরাসহ পার্টির কর্মীরা সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে। পার্টির কাঠামোকে যতদূর সম্ভব জনগণের মধ্যে কাজ করার জন্য উদ্যোগ ছিল এবং তাতে সফলতাও এসেছে। এই তিনটি এলাকায় পার্টির উদ্যোগ সামনের সারিতেই ছিল। আওয়ামী লীগ দলগতভাবে এই তিনটি ক্ষেত্রের সকল ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখেনি।

২.২১ ঠাকুরগাঁ (রানীশৈংকৈল) ও বরিশাল (বাবুগঞ্জ) এই ২ টি এলাকায় আওয়ামী লীগের নীতিহীন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ও কিছুটা পার্টির আভ্যন্তরীন বিভেদ ও সাংগঠনিক দূর্বলতার কারণে পার্টির প্রার্থীরা জিততে পারেননি। আবার প্রার্থীদের নৈতিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল, সেটাও পার্টিতে ভালোভাবে মিমাংসিত হয়নি। ২০১৪ সালের নির্বাচনে হাতুড়ি মার্কা নিয়ে এই দুই সিটে নির্বাচন করার পর ২০১৮ তে এসে নৌকা প্রতীক নেবার চিন্তা ছিল মস্ত ভুল এতে নির্বাচনী মার্কা তৈরী ও বিকল্প হবার সুযোগকে ছেড়ে দেওয়া হলো। যা ঠিক হয়নি।

২.২২ কক্সবাজার আসনে পার্টির প্রার্থী পার্টির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্টির নিজস্ব হাতুড়ি প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন। প্রচার প্রচারণায় এলাকায় পার্টির একটি অবস্থান তৈরী করা গেছে, কিন্তু নির্বাচনের দিন, আওয়ামী লীগ সরাসরি বিরোধীতা করেছে এবং প্রকাশ্যে কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে। ফলে, আমাদের সমর্থকরাও ভোট দিতে পারেননি।

২.২৩ ১৪ দলের সকল প্রার্থীর পক্ষেই পার্টি তার নিজস্ব সত্তা ও অবস্থান নিয়ে নৌকার পক্ষে প্রচারণা করার চেষ্টা করেছে। সকল ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মনোভাব এক ছিল না। অসহযোগিতা ও উপেক্ষার ভাব ছিল।

২.২৪ সি পি বি, বাসদ সহ ৮ দলীয় বাম জোট আলাদা ভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, তাতে নির্বাচনের উপর বা জনগণের উপর কোন বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। আসলে তারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কিনা সেটাও বোঝা যায়নি।

২.২৫ নির্বাচন কমিশন গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হিসেবেই কাজ করেছে। প্রশাসনের উপর কমিশনের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রন ছিল না। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ঐক্যজোট, ও ৮ বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে চাপ অব্যাহত রাখা হয়। নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নয়-এ অভিযোগ ছিল। দৃশ্যতঃই নির্বাচন কমিশনের মধ্যে প্রকাশ্যে বিভাজন ছিল। অন্ততঃ একজন কমিশন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তের প্রকাশ্যে বিরোধীতা করেছেন।

২.২৬ বিগত প্রায় এক দশকের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় নির্বাচনের পূর্বেই দেশের রাজনীতিতে একধরণের মেরুকরণ হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটা দৃশ্যমান ছিল যে, দেশের জনগণ দু'টো ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১৪ দলের তথা মহাজোটের আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, উন্নয়ন ও ধারাবাহিকতার শ্লোগানে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একদিকে সামিল হয়। অন্যদিকে, পরিবর্তন, সুশাসন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবীতে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তথা ২০ দলীয় জোটের নেতৃত্বে জনগণের আর একটি অংশের মেরুকরণ হয়েছে যারা মূলতঃ দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতির ধারা হিসেবেই বিবেচিত। এর বাইরে কোনো রাজনৈতিক মেরুকরণ জনগণকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

২.২৭ গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবস্থানগত ভাবে ১৪ দলের দিকে ছিল। তাদের এই অবস্থান যতটা না আদর্শগত, তার চাইতে বেশী সুবিধাপ্রাপ্তিনির্ভর। অনেক ক্ষেত্রে -এটা প্রকাশ্যেই চলে এসেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরে ঐক্যজোটের পক্ষের যারা, তাদের রাজনৈতিক অবস্থান দৃশ্যমান হতে পারেনি। কিন্তু, তাদের অবস্থানও ছিল এবং তাও সংকীর্ণস্বার্থে। সার্বিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র একটি entity হিসেবে কাজ করেছে। সামরিক, বেসামরিক আমলাযন্ত্র তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করেছে। কেন করেছে, সেটাও গভীরভাবে আলোচনার বিষয়। প্রাথমিকভাবে এটা বোঝা যায়, এই মনোভাবের পিছনে যে রাজনৈতিক অভিলাষ কাজ করেছে তাহলো, যেহেতু আমলাতন্ত্র ও তাদের প্রভাব নির্বাচনে জয়ে ভূমিকা রেখেছে, ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা মূখ্য ভূমিকা দাবী করবে। অর্থাৎ, রাজনীতি আরো প্রত্যক্ষভাবে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়লো। এর রাজনৈতিক ফলাফল নেতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী নিঃসন্দেহে। ভবিষ্যতে সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রযন্ত্র প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে চাইবে। প্রকাশ্যে ক্ষমতায় না থেকেই ক্ষমতায় অংশ নেবার মত। এই নির্বাচনে রাষ্ট্রের এই ভূমিকা দীর্ঘকাল ধরে আমলাতন্ত্রের বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এরপর থেকে এদেশের রাজনীতিতে, সামরিক, বেসামরিক সকল আমলাযন্ত্রের ভূমিকাকে বিশেষভাবে বিবেচনার ইংগিত বহণ করছে। নির্বাচনে স্পষ্টত: বিজয়ের লক্ষণ সত্বেও জনগণের উপর আস্থা না রেখে নির্বাচনে কেন প্রশাসনকে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে হলো-সেটা একটি বড় প্রশ্ন। পার্টিকে খুব গভীর মনোনিবেশ করে পথ খুঁজতে হবে।

২.২৮ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল বা তার পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। এই নির্বাচনেও তাদের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। নির্বাচনের পূর্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পরোক্ষভাবে, অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তফ্রন্ট তথা ২০ দলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ নিয়েছে। অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি নিয়ে সরকার তথা ১৪ দলের উপর তারা অব্যাহত চাপ রেখেছে। জামাতপ্রশ্নে অর্থাৎ জঙ্গীবাদ প্রশ্নে উদ্বেগ দেখালেও প্রকাশ্যেই তাদের সংগে স্বাভাবিক মিত্রতার অবস্থান নিয়েছে। পরোক্ষভাবে, শেখ হাসিনার উপর তারা চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখে। এই প্রশ্নে ভারতের সংগে তাদের ঐক্য-বিরোধের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে চীনের কোন প্রভাব বৃদ্ধি পাক ভারত তা চায় না, এই ক্ষেত্রে, পশ্চিমাশক্তির সঙ্গে তাদের ঐক্য রয়েছে, আবার এর ফলে, ভারত বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী বা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির ক্ষমতায় আসতে পারে বা পাকিস্তানপন্থী শক্তির কোন সুবিধা হোক তাও তারা চায় না। আজ এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, শেখ হাসিনার সরকারের সংগে চীনের সম্পর্ক ভালো, শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ এবং বানিজ্য এখন উল্লেখযোগ্য। এর ফলে, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সংগে শেখ হাসিনা সরকারের টানাপোড়েন আছে। রাশিয়া এখানে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাশক্তির বিরোধী

অবস্থান নিয়েছে, যার ফলে, চীন-রাশিয়া একটা অক্ষের অবস্থা তৈরী হয়েছে, যারা শেখ হাসিনা সরকারকে সমর্থন করে। উপরোক্ত অবস্থানের প্রেক্ষিতে নির্বাচনেও তাদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে। নির্বাচনের পর বিভিন্ন দেশের সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এই সমীকরণকেই সমর্থন করে।

২.২৯ এই নির্বাচনে দৃশ্যতঃ ঐক্যফ্রন্ট তথা ২০ দলীয় জোটের সকল শরিকদলের সাংগঠনিকভাবে ভরাডুবি হয়েছে। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক ভাবে বিস্তৃত হয়েছে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগে অন্য বিপদও বেড়েছে। দ্রুত দল বড় করার ফলে গোষ্ঠীবাদ প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের নেতারা বি এন পি জামাতের মতাদর্শের নেতাদেরকে দলে জায়গা দিয়ে চলেছে। কিন্তু, নির্বাচনে জনগণ নিজের ভোট না দিতে পারায় এবং প্রশাসনের ভূমিকায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, একে খাটো করে দেখা যাবে না। এর ফলে, আওয়ামী লীগ জনগণ থেকে একধরণের পরোক্ষ বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি। নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও এই ক্ষত ভবিষ্যতে গুরুতর সংকট সৃষ্টি করতে পারে। বিগত প্রায় দেড় যুগ ধরে যে রাজনৈতিক মেরুকরণ হয়েছে-এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং এর পরে তার একটি পর্যায় (phase) শেষ হলো। সামনের দিনে, অদূর ভবিষ্যতে দৃশ্যতঃ কোনো রাজনৈতিক সংকট নেই মনে হতে পারে, কিন্তু, মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের আশানুরূপ সম্পৃক্তি না থাকায়, সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ যে কোন সময় সংকট তৈরী করতে পারে। ব্যাপক জনগণ আওয়ামী লীগের উপর ক্ষুব্ধ, আবার বি এন পি, জামাত সম্পর্কেও ইতিবাচক নয়। ১৪ দলে থাকার ফলে, আওয়ামী লীগের এই অবিমৃষ্যকারিতার দায় আমাদেরও উপর কিছু আছে এবং থাকবে। কিন্তু, বিকল্প কোনো কিছু এই মুহূর্তে দৃশ্যমান নয়। **এই বাস্তবতার দু'টো দিক থাকতে পারে (১) বি এন পি-জামাত কোনঠাসা, আওয়ামী লীগও দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন এ পরিস্থিতিতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারাটি অব্যাহত রেখে একটি জনগণের নিজস্ব বিকল্প শক্তিভিত তৈরী করার বাস্তবতা ও সুযোগ রয়েছে। (২) কিন্তু, সেই বিকল্প গড়ে না উঠলে দক্ষিণপন্থার বিপদ বেড়ে যেতে পারে এবং তা 'বুমেরাং' হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে। কংগ্রেস এই সময়কালে রাজনীতির এই দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।**

২.৩০ আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতি বেড়ে যাবে। ক্ষমতার বলয় আওয়ামী লীগ তার হাতে রাখতে চায়। নির্বাচন পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে মনে হয়েছে, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদসহ ১৪ দলের কোন দলকেই আর কোন স্থান দিতে চায় না। এর পিছনে আন্তর্জাতিক চাপ এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বামপন্থাবিরোধী শক্তির বৃদ্ধি উভয়ই কাজ করেছে। আওয়ামী লীগের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ভাবাদর্শের এমনিতেই বিস্তৃতি ঘটেছে, এখন সম্ভাবনা আরও বাড়ছে। ফলে, দক্ষিণপন্থার ও সাম্রাজ্যবাদের বিপদ নিঃশেষ হবে না। সামাজিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে দেশে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সরকারে অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা:

২.৩১ সরকারে অংশগ্রহণ, মন্ত্রীত্ব নেওয়া, একটি বাম দল হিসেবে এ ছিল প্রথম ও সাহসী সিদ্ধান্ত। প্রথম বার মন্ত্রীত্বে যাওয়া ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অর্থাৎ নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকারের মন্ত্রী হিসেবে। ২০১৪ সালে নির্বাচনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে। দুই পর্যায়ে তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল। ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন ও সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়।

২.৩২ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে কমরেড সভাপতি যোগ্যতার সংগে অনেক কাজ করেছেন, তা জনগণের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। তবুও ভবিষ্যতের কর্মপন্থার জন্যে এখানে কিছু বিষয়ে আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

২.৩৩ মন্ত্রীত্ব নেবার ফলে সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে পার্টি সম্পর্কে একটা ইতিবাচক ধারণা তৈরী হয়। পার্টির পরিচিতি বাড়ে। কিন্তু, চিরাচরিত বামমহলে এর ফলে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল। দেশের বাইরেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে জনগণের পক্ষে যতদূর সম্ভব ইতিবাচক কাজ করার সুযোগ তৈরী করা এবং পার্টির সাংগঠনিক বিস্তৃতি করাই ছিল মন্ত্রীত্ব নেবার পক্ষে প্রধান যুক্তি। তবে, এতবড় একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে নেবার পর যে সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নেবার প্রয়োজন ছিল, পার্টি তা করতে পারেনি। মন্ত্রীত্ব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়নি, এটা পার্টির জন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়েছে।

২.৩৪ বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি থাকে। সেই দুর্নীতিকে মোকাবিলা করে কিভাবে স্বচ্ছভাবে জনগণের মধ্যে জনগণের জন্য কাজ করা যায়, সেটা উদাহরণ তৈরীর সুযোগ ছিল। কিন্তু, কার্যত: তা অনেকক্ষেত্রে করা যায়নি।

২.৩৫ ক্ষমতায় থাকার ফলে পার্টির সর্বস্তরে বড় ধরণের সুবিধাবাদিতার প্রবণতা তৈরী হয়েছিল। ফলে, এটা মতাদর্শগতভাবে পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ আত্ম- সমালোচনা কংগ্রেসের জন্য অপরিহার্য।

২.৩৬ তবে এটা মনে রাখতে হবে, এবারকার এ অভিজ্ঞতা পার্টির জন্য জরুরী ছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ ধরণের অভিজ্ঞতা বারবারই আসতে পারে, তার জন্যও প্রস্তুতি রাখাটা প্রয়োজন। এবারের ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে হবে। এটা মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ক্ষমতায় যাওয়া বা না যাওয়া নি:সন্দেহে একটি রাজনৈতিক কৌশল। যে কোন বাস্তবতায় সে ধরণের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তা যেন পার্টির মূল লক্ষ্যকে বিপথগামী না করতে পারে সেটাই দেখার বিষয়। ফলে, সে কৌশলকে জনগণের মধ্যে যাবার কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে নেবার যোগ্যতা পার্টিকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই অর্জন করতে হবে। তার কোন বিকল্প নাই। এ বারের নেতিবাচক ও ইতিবাচক সকল অভিজ্ঞতাই তাতে সহায়ক হবে।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি:

২.৩৭ নির্বাচনের ফলাফল, প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ করতে না পারা, প্রশাসনের প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাৎ হবার আশংকা এখন সাম্প্রতিক রাজনীতিতে প্রাসংগিক বিষয়। নির্বাচন পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এটা সুস্পষ্ট যে, এই নির্বাচনে ১৪ দলের বিজয় প্রত্যাশিত হওয়া সত্বেও, নির্বাচন প্রক্রিয়া জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। ফলে, বিগত প্রায় দু'দশকব্যাপী বি এন পি-জামাতের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জংগীবাদ, সন্ত্রাস আর চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি ও তার স্বাভাবিক মিত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গড়ে ওঠা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া একটা বড় ধরণের ধাক্কা খেয়েছে।

২.৩৮ ৯ম কংগ্রেসে জাতীয় পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বলা হয়েছিল, ''নবম কংগ্রেসের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার তার শাসনের চার বছর অতিক্রম করেছে। নির্বাচনে মহাজোটের ভূমিধ্বস বিজয়ের পর ৫ জানুয়ারি ২০০৯ এর কেন্দ্রিয় কমিটির সভায় নির্বাচন উত্তর সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবেচনায় সরকারকে সমর্থন ও প্রয়োজনে মন্ত্রীসভায় যোগদানেরও সিদ্ধান্ত নেয়। পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ এর সভা পরবর্তী সময়কালের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকারের ভালো পদক্ষেপসমূহের প্রতি সংসদের ভিতরে ও বাইরে তার সমর্থন অব্যাহত রাখলেও সরকারে যোগদান করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। এটা খুব স্পষ্ট যে, আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠনের ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে জনগণের দৃষ্টিতে পার্টি এই সরকারের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে পার্টি তার স্বাধীন অবস্থান তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে এই সরকারের ভালোমন্দ সকল কাজের রাজনৈতিক ফলাফলও পার্টিকে সেই পরিমাণে বহন করতে হয়েছে। এটা ছিল পার্টির জন্য নি:সন্দেহে একটি নতুন অভিজ্ঞতা। পার্টি অষ্টম কংগ্রেসে নির্দিষ্ট করেছিল যে, ওয়ার্কার্স পার্টিকে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোর সমর্থন দান ও নেতিবাচক প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধীতা করতে হবে। এরজন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী আন্দোলনের মাত্রা ও ফর্মও নির্দিষ্ট করতে হবে। এই অবস্থানের উপর দাঁড়িয়ে পার্টি কতখানি এগিয়ে যেতে ও জনগণকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে তা নির্ভর করছে কত যোগ্যতার সাথে পার্টি তার এই লাইন অনুসরণ করতে পারবে।" এই সিদ্ধান্ত পার্টি কতখানি অনুসরণ করতে পেরেছে তা পর্যালোচনার বিষয়।

২.৩৯ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ও তার পর্যালোচনা, ৯ম কংগ্রেসের পর দেশের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারে অংশগ্রহণ ও মন্ত্রীত্বে যাওয়া, এ সবকিছুর সার্বিক অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে পার্টির গৃহীত রাজনৈতিক কৌশলের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে গভীরভাবে বিবেচনা করে পার্টির আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল নির্ধারণ ১০ কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান করণীয়। সেই লক্ষ্যে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মেরুকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

২.৪০ **শিল্প:** বিগত দশকে বাংলাদেশের শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬% থেকে ১০% এর মধ্যে। ২০১৪ সালের পর থেকে বৃদ্ধির হার রয়েছে ৮% এর উপর। বাংলাদেশের মূল শিল্প কারখানার মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল (তৈরী পোশাকসহ) ২৫%, ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮%, ফার্মাসিউটিক্যালস ১৫%, জ্বালানী ও শক্তি ১০%, খাদ্য ও সংশ্লিষ্ট ৯%, আই টি সেক্টর ৪%, সিমেন্ট ৪%, সিরামিক ৩%, চামরা ৩%, পাটশিল্প ২%, কাগজ ও মুদ্রনশিল্প ১%, বিবিধ ৬%। এর মধ্যে প্রস্তুত পোশাক শিল্পের প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সবচেয়ে বেশী। গত অর্থবছরে তা ২৮.৬৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। শিল্প থেকে জি ডি পি তে গত অর্থবছরে অবদান ছিল ৩২.৫১%। দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৩২% নিয়োজিত শিল্পে। কিন্তু, এর ৭০% অনিয়মিত কর্মসংস্থানের অধীন।

২.৪১ ৯ম পার্টি কংগ্রেসে এক্ষেত্রে সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলা হয়েছিল, " শিল্পক্ষেত্রে সরকার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পাটকলসহ কিছু কলকারখানা পুনরায় চালু করেছে। কিন্তু আদমজী জুট মিলসহ বন্ধ কলকারখানা চালু, ক্যামিক্যাল কমপ্লেক্স চালুর ব্যাপারে সরকার এখনও পর্যন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। কারখানা চালু করার প্রক্রিয়া ও কর্মচ্যুত শ্রমিক পুনর্বহাল প্রক্রিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস হওয়ার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক শ্রমশক্তি, বিশেষ করে নারী শ্রম শক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কওে চলেছে॥ কিন্তু এই শিল্পে সরকারের মালিক তোষণনীতির কারণে তাদের মজুরি কাজের নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, আবাসন প্রশ্নসমূহের এখনও কোন সমাধান হয় নাই। ইতিমধ্যে গার্মেন্টস শিল্প ক্ষেত্রে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি এখন বড় ধরণের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ মত নীতি গ্রহণ না করলে পোশাক শিল্পের বাজার থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবার হুমকি দিচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে মার্কিনী এই হস্তক্ষেপ একেবারেই প্রকাশ্য।

২.৪২ এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেতন কমিশনের রোয়েদাদ কার্যকর করলেও মজুরি কমিশনের রোয়েদাদ বাস্তবায়িত করে নাই। শ্রমআইনের সংশোধনও এখনও পর্যন্ত আটকে আছে। ঘোষণা দেওয়া সত্বেও বন্ধ রেশম কারখানা চালু হয়নি। বকেয়া মজুরিসহ অন্যান্য বেতন ভাতা এখনও প্রদান করা হয়নি। চালু করা কারখানাগুলোর শ্রমিকদের কমিশনের রোয়েদাদ প্রদান করা হয়নি। মনগড়া মজুরি দিচ্ছে। চালু করা মিলগুলো শ্রমিকদের ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে চালানো হচ্ছে, স্থায়ী করা হচ্ছে না। জুটমিলগুলোয় পূর্বেও ন্যায় দুর্নীতি লুটপাট চলছে, পূর্বের ন্যায় হাজার হাজার টন পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেই। মজুরী এখনও পাচ্ছে সত্য, কিন্তু উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় না হওয়ার কারণে মজুরি বাকি পড়ার অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমিকদের কারখানা বন্ধ হওয়ার আতংক বিরাজ করছে "। শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। জিডিপিতে শিল্পের অবদান বাড়ছে। কিন্তু শ্রমিকদের সম্পর্কে ৯ম কংগ্রেসে উল্লিখিত বাস্তবতার কোন উন্নতি তো হয়ইনি, বরং শ্রমিকের অবস্থার অবনতি হয়েছে।

২.৪৩ **কৃষি:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখনও প্রধান ভূমিকা পালন করছে কৃষি। গ্রামীন শ্রমশক্তির ৪১% এখনও কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োজিত। জি ডি পিতে কৃষির অবদান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ১৪.৭৪%, ২০১৭-১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭% এর উপরে। ৭ম পাঁচশালা পরিকল্পনায় কৃষিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল, ৩৮৮.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। একই বছরে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৩.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে খাদ্য আমদানির পরিমান ছিল ৫৮.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১.৩৩ লক্ষ টন, গম ৫৬.৯০ লক্ষ টন)। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ । ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২০,৯৯৮ কোটি টাকা। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আরও ৬,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ঋণ বরাদ্দ করা হয়। ২০১৭-১৮ সালে কৃষিতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১%।

২.৪৪ কৃষি খাতে সেচ, চাষ, রোপন, ফসল কাটা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারে বাংলাদেশ যে এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, তা আজ বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। এ দেশের কৃষকেরা জমিচাষ, সেচ ও ফসল মাড়াই ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে ফসল কাটাসহ দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কাজ। জমিচাষের ক্ষেত্রে ৯০%, সেচে প্রায় ৯৫%, কীটনাশক প্রয়োগে ৮০%, মাড়াইতে ৭০% যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। শুধুমাত্র রোপণের ক্ষেত্রে এখনও ০.১%, ফসল কাটায় ০.৮% ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.৪৫ কৃষিতে মজুরি বৃদ্ধির হার বেড়েছে ধারাবাহিকভাবে। ২০১৫-১৬ সালে ৬.৪১%, ২০১৬-১৭ সালে ৬.৫০% এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেড়েছে প্রায় ৬.৭%।

২.৪৬ পরিসংখ্যান থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, কৃষিতে যন্ত্রায়ন ও বাজারের মধ্য দিয়ে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কৃষি উপকরণ, বীজ, সার, সেচ প্রত্যেকটি বিষয়ে কৃষি এখন পুঁজি নির্ভর। এ ছাড়া উৎপাদিত শষ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাজার এখন প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ফলে, এর প্রেক্ষিতে ভূমি মালিকানা ও তার হস্তান্তর দৃশ্যত: বিত্তবান মানুষের হাতে যাচ্ছে। খোদ কৃষকের হাতে কৃষিজমি কমতে থাকছে। এ প্রক্রিয়া কৃষিতে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ইংগিত বহণ করে। 'গোল্ডেন সিড' ব্যবসার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ কৃষিতে আন্তর্জাতিক পুঁজির আক্রমন। এটা দেশের কৃষি ব্যবস্থার উপর আঘাত।

২.৪৭ ৯ম কংগ্রেসে বলা হয়েছিল, "কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপরসা কিছু নীতি ও উদ্যোগ থাকলেও মূলে হাত দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে ভূমি সংস্কার, খাসজমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ, গ্রামীন শ্রমজীবি মানুষের আশু ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান, সার, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উপর বাজারের প্রভাব বন্ধ এবং সর্বোপরি কৃষি পণ্যের প্রকৃত মূল্য নিশ্চিত করা কৃষিক্ষেত্রে জরুরী"। ৯ম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সঠিক ছিল। কিন্তু, কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় সমস্যার আরো সুনির্দিষ্ট করে কৃষকের সংগ্রামের পথ নির্দেশ জরুরী।

২.৪৮ ৯ম কংগ্রেসে খুব সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল, "কৃষি ও শিল্পে সবচেয়ে বড় অভাব উপযুক্ত কৃষক-ক্ষেতমজুর ও শ্রমিক আন্দোলন। দেশের কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন কার্যত শক্তিহীন। এ ক্ষেত্রে কিছু প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গেলেও ব্যাপক কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সাথে তাদের কার্যকর কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্নীতি সুবিধাবাদের দলবাজির পক্ষে এমনভাবে নিমজ্জিত যে, সাম্প্রতিক অতীতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতাও তারা বজায় রাখতে পারছে না। বিশেষ করে সবচেয়ে বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অসংগঠিত। ফলে, এই শিল্পে, মাঝে মাঝেই যে বিস্ফোরণ ঘটে, তা কেবল গার্মেন্টস শিল্পেই নয়, সামগ্রিক অর্থনীতি, শিল্প-সম্পর্কেও ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।" বর্তমান পরিস্থিতিও একই রয়েছে, ফলে, সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল পুংখানুপুংখরূপে নির্দিষ্ট করতে হবে।

শেয়ার মার্কেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও লুটপাট

২.৪৯ ৯ম কংগ্রেসে বলা হয়েছিল, 'বর্তমান সরকারের আমলে শেয়ার মার্কেট বিপর্যয় ও লুটপাট এ চরম কেলেংকারীর জন্ম দিয়েছে। পুঁজি গঠন শেয়ার মার্কেট ভূমিকা রাখলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শেয়ার মার্কেট ফাটকাবাজির ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। শেয়ার মার্কেট ম্যানিপুলেট করে পরিচিত কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি বিশাল অংকের টাকা লুটে নিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগকারী স্বল্প পুঁজির মালিকরা সর্বস্বান্ত হয়েছে।' শেয়ার মার্কেট কেলেংকারীর মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে যে অনাস্থা তৈরী হয়েছে, তা আজও অব্যাহত আছে। শেয়ার মার্কেট আর সেই অর্থে ঘুরে দাঁড়ায়নি।

২.৫০ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের ব্যাংকের সংখ্যা ৫৯ ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪ টি। শেয়ার মার্কেটের মত ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও একই ধরণের লুটপাটের ঘটনা উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব মোতাবেক 'ডিফল্টেড লোন' বা খেলাপি ঋণের এর পরিমান ৭৪,৩০৩ কোটি টাকা (২০১৭-১৮ অর্থবছর) এবং এখন তা ১ লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে সংসদের বাজেট অধিবেশনে বলা হয়েছে। ফার্মার্স ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক প্রভৃতির ঋণ কেলেংকারীর বিষয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, কিন্তু, এ সম্পর্কিত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে না, ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। বরং ২০১১-২০১৮ সালের মধ্যে এ সকল দুর্নীতিবাজ ব্যাংকগুলো রক্ষায় সরকার ১৩,৬৬০ কোটি টাকার 'হ্যান্ড আউট' দিয়েছে।

২.৫১ আগে আইন ছিল, ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকে একই পরিবারের ২ জনের বেশী বোর্ড অব ডিরেক্টরের সদস্য হতে পারবে না। সে আইন পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবারের সকলেই এখন বোর্ড অব ডিরেক্টরের সদস্য হতে পারবে। এর ফলে, কার্যত: দুর্নীতির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুতশক্তি ও জ্বালানি:

২.৫২ ৯ম কংগ্রেসে বলা হয়েছিল, 'বিদ্যুত সংকট কাটিয়ে তুলতে সরকারের গৃহীত নীতি জন ও জাতীয় জীবনের সংকট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। দ্রুততার সাথে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুত সরবরাহের জন্য সরকার রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট, পিকিং পাওয়ার প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করে। এসব পাওয়ার প্লান্ট প্রতিষ্ঠায় কোন স্বচ্ছতা ছিল না। এ ব্যাপারে যাতে কোন প্রশ্ন করা না যায় তার জন্য সরকার একটি ইনডেমনিটি আইনও পাশ করে। রেন্টাল পাওয়ার প্লান্টে জ্বালানী নির্ভরতা বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে বিশাল চাপ সৃষ্টি করে, যা জাতীয় অর্থনীতিকে এক নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়। অপরদিকে বিদ্যুতের দাম দফায় দফায় বাড়ানোর মধ্য দিয়ে জনগণের উপরও চরম আর্থিক চাপানো হয়েছে।' বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক বেশী পরিমাণ জনসংখ্যা বিদ্যুত সংযোগের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, কিন্তু এই খাতের অন্তর্নিহিত দূর্বলতা রয়ে গেছে। বর্তমানে বিদ্যুত উৎপাদনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ২০,০০০ মেগাওয়াট, উৎপাদিত হতে পারে ১৬,৫২৫ মেগাওয়াট। ৭% প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখতে হলে, '২০১৬ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান' অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে প্রয়োজনীয় বিদ্যুত উৎপাদন হতে হবে ৩৪,০০০ মেগাওয়াট। দেশের বিদ্যুত উৎপাদনের গ্যাস নির্ভরতা প্রায় ৬৬%। অথচ, দেশের গ্যাস মজুত কমছে। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে না। এ ছাড়া জ্বালানীর মধ্যে রয়েছে কয়লা, তেল যা আমদানি নির্ভর। হাইড্রো-ইলেকট্রিক উৎপাদনের সম্ভাবনা সীমিত। ২০২৩ সালের মধ্যে রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট সম্পন্ন হবার কথা। আরও কয়েকটি মেগাপ্রজেক্টও নির্মানাধীন। তাই বিদ্যুত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে, দুর্নীতি, সিস্টেম লস, নতুন প্লান্টগুলো সময়মতো শুরু না করতে পারা, বিদ্যুত চুরি এবং পাওয়ার প্লান্ট ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থের অভাব। আপদকালীন প্রয়োজনে সৃষ্ট ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্পগুলির বিনিয়োগকৃত অর্থ প্রথম মেয়াদে উসুল হওয়া সত্বেও বিশেষ মহলের সুবিধাদানের জন্য তার মেয়াদ বৃদ্ধি করে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান গোনা হচ্ছে। বছরে কম-বেশী জ্বালানী তেলে ৯ হাজার, গ্যাসে সাড়ে ৪ হাজার এবং বিদ্যুতে সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে বছরে ঘাটতি প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। বিগত বছরগুলিতে এ ঘাটতি মোকাবেলায় দফায় দফায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দামবৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে জনজীবনের নাভিশ্বাস উঠছে। বাংলাদেশে প্রায় ৩.৬ গেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুত উৎপাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে। মাস্টার প্লান অনুযায়ী, ২০২০ সালের মধ্যে ১০% নবায়নযোগ্য বিদ্যুত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১৭% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা থাকলেও দুর্নীতি, পরিকল্পনাহীনতা এবং বিশেষমহলের সুবিধাদানের প্রবণতা নবায়নযোগ্য খাতকে এখনই রুগ্ন খাতে পরিণত করা হয়েছে। বিদ্যুতখাতে আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পুরনো আমলের সঞ্চালন কাঠামো। বিদ্যুত উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন কাঠামো আধুনিকায়ন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা জরুরী।

২.৫৩ গ্যাস সংকটের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। গ্যাস উৎপাদনক্ষেত্রে বড় বাধা দুর্নীতি। বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য বাপেক্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেওয়া হয় না। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সাল অবধি বাপেক্স ৬টি অনুসন্ধান কূপ ও ৯টি উন্নয়ন কূপ খনন করে। তাতে প্রতি কূপে ব্যয় হয় ৯.৯২ লক্ষ মার্কিন ডলার। ২০১২-২০১৪ সাল অবধি বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসিজিএফএল-এর মালিকানাধীন ৩টি ফিল্ডে ১৫টি কূপ খনন করে গ্যাজপ্রম। তাতে কূপ প্রতি ব্যয় হয় ২০.৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার। বাপেক্স-এর তুলনায় ৩-৪ গুণ অর্থ ব্যয় বেশী হয়। গ্যাজপ্রম-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে বিধি-বিধান উপেক্ষা করে বেশ কিছু অন্যায় ও অযৌক্তিক সুবিধা দেয়া হয়েছে। ফলে গ্যাস উৎপাদন ব্যয় যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন কূপ খননেও ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এর পিছনে মন্ত্রীদেরও হাত আছে।

২.৫৪ সাগর সম্পদ আহরণে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের ভূগঠন এবং সেখানে তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য 'মালটি ক্লাইয়েন্ট সিসমিক সার্ভে' পরিচালনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বিডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মূল্যায়িত বিডার-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে । মাল্টি ক্লাইয়েন্ট সার্ভের তথ্য বিনিয়োগকারীর জন্য উন্মুক্ত করা হলে সমুদ্রসম্পদ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা আরো বেশী সমৃদ্ধ হবে। অথচ তথ্য গোপন রাখার অজুহাতে মাল্টি ক্লাইয়েন্ট সার্ভের কাজ গ্যাজপ্রম'কে দেয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। তাহলে তা হবে জনস্বার্থ বিরোধী এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নাইকো চুক্তি বাতিল হলেও চুক্তিভূক্ত ছাতক (পূর্ব) গ্যাসক্ষেত্রে সম্ভাব্য মজুদ গ্যাস (১ টিসিএফ) উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যেখানে তীব্র

গ্যাসসংকট মোকাবেলায় বছরে ১৮২.৫০ বিসিএফ এলএনজি আমদানী করা হচ্ছে এবং ১৮২.৫০ বিসিএফ আমদানীর অপেক্ষায়, সেখানে মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে থামানো হয়, ছাতক (পূর্ব) গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়া হয় না। অথচ তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়াতে তৎপরতা চলছে। এটি জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির ফসল।

২.৫৫ সাগরের গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সান্তোষের সাথে মগনামা ২ কূপ খননে বাপেক্স-এর যৌথ উদ্যোগ চুক্তি ২০১৬ সালে সম্পাদিত হয়। সে-চুক্তিতে ২০১৪ সালে শেষ হওয়া পিএসসি পুনরুদ্ধার হয়, উক্ত পিএসসিভূক্ত অনুসন্ধান কূপ খনন খরচের অংশ বিশেষ বাপেক্স'কে উসুল করতে হয় এবং আইওসি'র গ্যাস ক্রয় মূল্যহার ৬ ডলারেরও বেশীতে ধার্য হয়। অর্থাৎ এলএনজি'র মূল্যহার অপেক্ষা বেশী। উক্ত সব প্রস্তাবসহ সান্তোষ বাপেক্সের নিকট আগ্রহপত্র পেশ করে। কারিগরি ও আর্থিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সান্তোষ-এর এ-প্রস্তাবে বাপেক্স আপত্তি দেয়। কিন্তু উচ্চপর্যায়ের ক্ষমতাবানদের হস্তক্ষেপে বাপেক্সের আপত্তি শোনা হয়নি। খননে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া যায়নি। বাপেক্স উক্ত কূপ খননে অংশগ্রহণের সুযোগও পায়নি। ফলে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়নি। মাঝখান থেকে সান্তোষকে ২৬২ কোটি টাকা দিতে হয়েছে।

২.৫৬ **দুর্নীতিতে কয়লা:** বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা চুরির ঘটনা অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য-প্রমাণাদিতে দেখা যায়, ইয়ার্ডে কয়লা নেই। অথচ কর্তৃপক্ষ তা জানে না, দেখেওনি। ১.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লার হিসেব নেই। প্রথমে এ কয়লা মজুদ দেখানো হয়। পরে এ কয়লা চুরি অভিহিত করে থানায় ও দুদকে মামলা করা হয়। যদিও কয়লা চুরি হয়েছে কিনা, তারা তা জানেও না, বুঝেও না। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এজিএম-এ সে কয়লা সিস্টেম লস হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, নিয়মিত কয়লার কোন জমা-খরচের হিসাব নেই। ২০১২ থেকে ২০১৮ সালের জুলাই অবধি কয়লার সাথে সম্পৃক্ত অগ্রহণযোগ্য প্রায় ২.৫ লক্ষ টন পানি কয়লা হিসেবে বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র ক্রয় করে। এই হিসাবে ধারণা করা যায়, বিসিএমসিএল বিক্রয়কৃত কয়লায় সম্পৃক্ত প্রায় ৫ লক্ষ টন অগ্রহণযোগ্য পানি কয়লার দামে বিক্রি করেছে। এটাও দুর্নীতির জলজ্যান্ত প্রমান।

২.৫৭ বিদ্যুত, গ্যাস ও জ্বালানী প্রসংগে তেল গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটির সংকীর্ণ নীতি ও পদক্ষেপ ঐ আন্দোলনকে বন্ধ্যা করে দিয়েছে, তাকে কার্যকর রূপ দিতে পারছে না। তেল গ্যাস জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনকে আরোও সম্প্রসারিত করতে হবে। তারজন্য এক্ষেত্রে পার্টিকে ভুল প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সংকট

২.৫৮ কোন দেশের উন্নয়ন টেকসই কিনা সেটা অনেকখানি নির্ভর করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মান ও কার্যকারিতা কতটুকু তার উপর। বিগত এক দশকে দেশের শিক্ষার পরিকাঠামোর বিস্তৃতি ঘটেছে। দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১,২০,৬৭২, এবতাদিয়া মাদ্রাসা ২৬৭৩, বেসরকারি কওমি মাদ্রাসা ১৩,৯০২, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ৬,৯০৬, কলেজ ৪১১৩, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৯৭ টি। স্বাক্ষরতার হার ৭২.৭৬%। বাজেট বরাদ্দ গত ৫ বছরে গড়ে জিডিপির ২%। কিন্তু, কোন বিচারেই বাংলাদেশের শিক্ষার মানকে যুগোপযোগী বলা চলে না। ২০১০ সালে শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন হতে পারেনি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন, তার অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারায় প্রত্যাবর্তনের জনআকাংখার প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুধু অতি ধীরই নয়, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার অভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয় না। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। তাই, আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অস্থিরতা, উচ্চ শিক্ষায় সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষের সন্তানদের সুযোগের অভাব, হেফাজতের কাছে নতজানু হয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কারিক্যুলামে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপোষ, কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে চরম নৈরাজ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও দুর্নীতির পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরেই তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরে কিছুটা লিঙ্গ বৈষম্য প্রায় দূর হওয়া। প্রতি বছর, ক্লাশ শুরুর আগে বিনামূল্যে বই বিতরণও একটি বড় ধরণের সাফল্য।

২.৫৯ তবে, উচ্চ শিক্ষা বলতে গেলে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, দলবাজি, দুর্নীতি আজ লাগামহীন স্তরে পৌঁছেছে। উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়নি, গবেষণার বাজেট নেই, পরিকল্পনা নেই। বিশ্ব মান তো দূরের কথা সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় যে শুধু জ্ঞান অর্জনের জায়গা নয়, জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা এটা এখন বিস্মৃতপ্রায়। ফলে, দেশের উন্নয়নকে অর্থবহ আর টেকসই হবার জন্য যে প্রকৃত জ্ঞান আর শিক্ষায় তরুণ সমাজ তৈরী করা দরকার, দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা তা তৈরী করতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার সকল সামর্থ্যই যেন এই শিক্ষা ব্যবস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এটা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রের জন্যই অশনিসংকেত।

ধনবৈষম্য: উন্নয়ন বনাম বৈষম্য

২.৬০ আগেই বলা হয়েছে, বিগত ১০ বছরে কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিরও দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। মাথাপিছু গড় আয় বেড়ে ১৭৫২ ডলার হয়েছে, দেশ অর্থনীতিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। এ যাবৎকাল জি ডি পি প্রবৃদ্ধির হার ৭% এর উপরে থেকেছে। এবার তা ৮.২৫% পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মন্দা বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে খুব প্রভাব ফেলতে পারেনি। মুদ্রাস্ফীতিও ৫.৫% এর কাছাকাছি। দারিদ্র কমে দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ৩৩ বিলিয়ন ডলার। দেশের দৃশ্যমান মেগাপ্রজেক্টগুলির মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮,০৬৭ কোটি টাকা, অগ্রগতি ৬৩%), পদ্মাসেতু রেল সংযোগ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪,৯৮৯ কোটি টাকা, অগ্রগতি ২৩.৪৭%), মেট্রোরেল (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১,৯৮৫ কোটি, অগ্রগতি ২৬.২০%), রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (প্রাক্কলিত ব্যয় ১,১৩,০৯৩ কোটি টাকা, অগ্রগতি ১৩.৯৫%), রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রাক্কলিত ব্যয়, ১৬০০০ কোটি টাকা, অগ্রগতি ২২.৮০%), মাতারবাড়ী কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয়, ৩৫,৯৮৫ কোটি টাকা, অগ্রগতি ২১.১৫%), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮,০৩৪ কোটি টাকা, অগ্রগতি ১৮.৪৬%), পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,৩৫০ কোটি টাকা, অগ্রগতি ৩৮.১৮%), সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর (পিপিপি প্রকল্প, কাজ শুরু হয়নি), এল এন জি টার্মিনাল (প্রাক্কলিত ব্যয়, ১৩০০০ কোটি টাকা, শেষ হয়েছে)। এ সময়কালে এম ডি জি অর্জিত হয়েছে, এস ডি জি রও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। দৃশ্যত:ই এসবই উন্নয়নের চালচিত্র।

২.৬১ কিন্তু, সামষ্টিক অর্থনীতির এই ইতিবাচক চিত্রের পাশাপাশি ব্যষ্টিক অর্থনীতির নেতিবাচক দিকগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অর্থনীতির এই উন্নয়ন শ্রমিক-কৃষক সহ শ্রমজীবি ও নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে যেতে পারেনি। ঘুষ-দুর্নীতি-দলীয় সংকীর্ণতা, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির সর্বব্যাপী আগ্রাসী প্রসার জনজীবনে গভীরভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ধনীগরীবের বৈষম্য বেড়েছে লাগামহীনভাবে। বাংলাদেশে ধনকুবেরের সংখ্যা গত ৫ বছরে বেড়েছে ১৭ শতাংশ। গিনি সূচক ২০১০ সালে ছিল ০.৩২, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৮ এর উপরে। গ্রামীন অর্থনীতির সঙ্গে শহর কেন্দ্রিক অর্থনীতির বৈষম্য বেড়েছে। গ্রামীন কর্মসংস্থান কমছে, ফলে মানুষ শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলি দুর্নীতি, দলীয় সংকীর্ণতায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। বেকারত্ব, কাজের অনিশ্চয়তা, মাদকাসক্তি গোটা যুব-সমাজকে হতাশার গভীরে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা যাদের বয়স ১৮ থেকে ৪০ এর মধ্যে এখন ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, তাদেরকে কার্যকরভাবে সমাজের উন্নয়নের ধারায় নিয়ে আসার কার্যকর পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ অনুপস্থিত। নিয়মিত কর্মসংস্থানের পরিমান মাত্র ১২.৩%, অনিয়মিত কর্মসংস্থান ৮৭.৭%। বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ প্রায়।

সামাজিক অবস্থা: শিশু ও নারী নির্যাতন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংখ্যালঘু প্রসংগ, আদিবাসী

২.৬২ ৯ম কংগ্রেসেই উল্লেখ করা হয়েছিল, 'সামাজিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় নীতি, নৈতিকতা, সামাজিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এক চরম সংকট সৃষ্টি করে রেখেছে। দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তৃতি, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এখন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।' সে অবস্থার খুব কিছু উন্নতি হয়নি। নয়া-উদরিনীতিবাদের উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব তরুণ সমাজের মধ্যে বিলাসিতা, পণ্যমুখীনতা, অনিশ্চয়তা সমাজের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করেছে। এর প্রভাবে তরুণ সমাজের মধ্যে

রাজনীতিহীনতা, রাজনীতিবিমুখতার জন্ম হয়েছে। সামাজিক যুথবদ্ধতার পরিবর্তে জন্ম নিচ্ছে এককেন্দ্রিকতা। যার প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। রাজনীতি যেন আজ তৈরী হয়েছে, নষ্টচরিত্রের মানুষের জন্য। এই শূন্যতার সুবিধা নিচ্ছে শোষক ও শাসক শ্রেণী। এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর যে নির্ভরতা বাড়ছে, তার সুযোগ গ্রহণ করছে মৌলবাদীরা।

২.৬৩ ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর রাষ্ট্রের আচরণে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেও, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিস্তৃতি বেড়েছে বই কমেনি। ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিস্তৃতি ঘটেছিল। তার জের কিছুটা স্তিমিত হলেও নি:শেষ হয়নি। আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদীরা এখনও রাষ্ট্রীয় পোষকতা পাচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সহিংস আচরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এই আচরণ রাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী হলেও প্রশাসন ও নীচের স্তরের ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয় প্রশ্রয়েই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এ ধরণের আচরণের প্রকাশ ঘটছে। এই মুহূর্তে জামাত-বি এন পি রাজনৈতিকভাবে অনেকটা হীনবল হলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথ অব্যাহত রাখবে।

২.৬৪ সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জীবন কখনই নিরাপদ নয়। সাম্প্রতিককালে পাহাড়ী, সমতল উভয় স্থলে হত্যা, গুম, সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। আদিবাসীদের জমি, বসতভিটা দখলের ঘটনা এখন নৈমিত্তিক। 'আদিবাসী' সম্পর্কে সরকারের নীতির কারণে নিম্নস্তরের সরকারি প্রশাসন আদিবাসীদের রক্ষার চেয়ে তাদের উপর উৎপীড়নে অধিক তৎপর।

২.৬৫ কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবি নারীদের মজুরি বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা, শিশুশ্রম এক মৌলিক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে।

শাসন ব্যবস্থা: আইন-শৃংখলা, ঘুষ, দুর্নীতি, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, অনিরাপদ সড়ক ও জনজীবনের নিরাপত্তা:

২.৬৬ ১৪ দলের অন্যতম লক্ষ্য ছিল আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করে জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ঘুষ, দুর্নীতি, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি বন্ধ করা। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতিই হয়েছে। বিশেষ করে পুলিশসহ আইন শৃংখলা বাহিনীর উপর দলীয় নিয়ন্ত্রন এখন পরিণত হয়েছে দলের উপর পুলিশ ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রনে। ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাচন এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। সরকারী দলের ভরসা আর জনগণের উপর নাই, পুলিশ ও প্রশাসনের উপর চলে গেছে। এ অদ্ভুত পরিস্থিতি জনজীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করেছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম ঘুষ-দুর্নীতি এবং শৃংখলার অভাব তরুণদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে হতাশা ও ক্ষোভ। তারফলে, ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হয়েছে কোটাবিরোধী ব্যাপক আন্দোলন। সরকারও বাধ্য হয়েছে কোটা স্থগিত করতে। এই স্বত:স্ফূর্ত আন্দোলনের পিছনে জামাত-বি এন পি সহ অনেক বিরোধীদের হাত ছিল। কিন্তু, এই আন্দোলনের একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল এবং এখনও আছে, এটা স্বীকার করতে হবে।

২.৬৭ সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল বিচার বহি:র্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করা। সেটা না হয়ে তা বেড়ে গেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গুম ও অপহরণ। এ ক্ষেত্রেও আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর যোগসাজস লক্ষ্যনীয়। এ বিষয়ে সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনার মুখে পড়লেও খুব গ্রাহ্য করছে না।

২.৬৮ অনেক আলোচনা, সমালোচনা হওয়া সত্বেও 'দুর্নীতি দমন কমিশন' কার্যত: স্বাধীন ও দৃঢ় ভূমিকা নিতে পারছে না। এর আগে পদ্মাসেতু, ডেসটিনি ও হলমার্ক কেলেংকারীর প্রশ্নে জাতীয়, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কিছুটা সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকায় এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু, দেশে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সে তুলনায় কমিশনের কাজ অপ্রতুল। অনেক ক্ষেত্রে অসহায় ও ঠুটো জগন্নাথের অবস্থা।

২.৬৯ ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশের সড়ক ও পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রতিদিন সড়ক দূর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সড়ক যেন মানুষের জন্য মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে। অথচ, এর হাত থেকে পরিত্রানের কোন দৃশ্যমান উদ্যোগ বা পরিকল্পনা সরকারের নেই। সাম্প্রতিককালে, কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রেক্ষিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন দেশকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু, সরকার এই

আন্দোলনকেও সঠিকভাবে 'হ্যান্ডেল' করতে পারেনি। ১০ম কংগ্রেস জননিরাপত্তার বিষয়টিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখে এর সমাধানের জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের জোর দাবী উত্থাপন করছে।

২.৭০ সম্প্রতি ঢাকার চকবাজারের চুড়িহাট্টায় 'ওয়াহেদ ম্যানসন' ও বনানীর 'এফ আর টাওয়ার' এ ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে শতাধিক মানুষের করুণ মৃত্যু দেশের মানুষের সামনে জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে দেশের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভয়াবহ দূর্বলতার বিষয়টিকে তুলে এনেছে। অগ্নিকান্ডের মোকাবিলা করার জন্য আবশ্যিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য যে শত শত কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে, তা আদতে কি হয়েছে- কংগ্রেস তার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব করছে। পাশাপাশি, সকল ধরণের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দাবী উত্থাপন করছে।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

২.৭১ ৮ম ও ৯ম কংগ্রেসেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে তার চরম প্রতিক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হলে, এতে বিশাল নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে। দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষ চরম পরিবেশ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ জলবায়ুর এই পরিবর্তনের জন্য মুখ্যত: দায়ী উন্নত দেশগুলির মুনাফাভিত্তিক উন্নয়ন। এর নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যার ৪% বাস করে। কিন্তু সে দেশেই পৃথিবীর ক্ষতিকারক গ্যাসের ১৫% শতাংশ নির্গত হয়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশ সংক্রান্ত কিয়োটো প্রটোকলে সম্মতি দেয়নি। সর্বশেষ, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি থেকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার করেছে।

২.৭২ ১০ম পার্টি কংগ্রেসও দৃঢ়ভাবে মনে করে, উন্নত দেশসমূহ দ্বারা সৃষ্ট এই সমস্যার দায় উন্নত দেশগুলোকেই নিতে হবে। জলবায়ু সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক তহবিলে তাদের জন্য ধার্যকৃত হিস্যা তাদেরকে দিতে হবে এবং এই তহবিল ব্যয়ের এক্তিয়ার ব্যবহারকারী দেশগুলোর উপর রাখতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চরম ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

২.৭৩ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে গৃহীত প্রকল্পসমূহ যাতে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন হয় এবং এ সংক্রান্ত তহবিল যাতে স্বচ্ছতার সাথে ব্যয় হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

২.৭৪ ৮ম ও ৯ম কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে দেশের নদী ও পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দেশবাসীর প্রতি সতর্ক থাকার আহ্বান রেখেছে। এটি একটি লাগাতার সংগ্রাম বিধায় ১০ম কংগ্রেসও ১) অভিন্ন নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা ২) স্বাভাবিক বন্যার মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে ভূমি গঠন প্রক্রিয়ার পুনরুদ্ধার করা ৩) নদী, খাল খনন, প্রাকৃতিক জলাশয়, হাওড়-বাওড় বিল রক্ষা ৪) বিদ্যমান পুকুর রক্ষা ও নদী অববাহিকাসহ বিলগুলো জলাধার করার বিষয় পুনরুল্লেখ করছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতার বিরুদ্ধে এ এলাকার পার্টি ও জনগণের লাগাতার সংগ্রামকে কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে এবং অর্জিত সফলতা বাস্তবায়নের লড়াই অব্যাহত রাখার আহ্বান রাখছে। প্রস্তাবিত ডেল্টাপ্লান-২১০০ এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে।

২.৭৫ সরকার দেশের ৫৩ টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংএর কাজ শুরু করেছে। জলাশয় সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়েছে। ঢাকার সন্নিকটে সব নদী আজ দূষণে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায়। এগুলো রক্ষা না করা গেলে ঢাকার জনপদ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। এ সকল বিষয় কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠনসমূহকে নিয়ে ধারাবাহিক উদ্যোগ নিতে হবে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মেরুকরণঃ

২.৭৬ **১৪ দলীয় জোট ও পার্টির অবস্থান:** ৪ দলীয় শাসনের সাম্প্রদায়িক ও জংগীবাদ উত্থানের এক ক্রান্তিলগ্নে ২০০৪ সালে গড়ে ওঠে ১৪ দলীয় জোট। জঙ্গীবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১৪ দলের যাত্রা শুরু। । এটা সত্য যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ১৪ দল ক্ষমতায় গিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি, জংগীবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিকভাবে, বি এন পি-জামাত অনেক কোনঠাসা হয়েছে। জংগীবাদি কার্যক্রম দৃশ্যতঃ কমেছে। কিন্তু, ১৪ দল কখনই তৃণমূলে কাঠামোগত সাংগাঠনিক ভিত্তি পায়নি। বিশেষ সঙ্কটের সময় কিছু রাজনৈতিক বিবৃতি দানের মধ্যেই ১৪ দলীয় কাঠামো সীমাবদ্ধ রয়েছে-এই বাস্তব চিত্র অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কোন সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা নিতে ১৪ দল জোটগতভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ব্যাপক দলীয় সংকীর্ণতা, ছাত্রলীগ, যুবলীগের গণবিরোধী কার্যক্রম ১৪ দলীয় সরকার ও জোটকে জনগণ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করেছে। পার্টি ধারাবাহিকভাবে জনবান্ধব কাজের এর উপর জোর দেবার চেষ্টা করেছে। ১৪ দলীয় জোটকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু, পার্টি এক্ষেত্রে কার্যতঃ খুব সফল হয়নি। তত্বগতভাবে পার্টি এটা গ্রহণ করলেও সাংগঠনিকভাবে কিছু কিছু স্থানে ব্যতিক্রম ব্যতীত একে বাস্তবে রূপ দেবার সার্বিক কৌশল গ্রহণে তেমনভাবে সফল হতে পারেনি। পার্টি বিভিন্ন সময়ে নিজস্ব কাজের উপর জোর দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় পার্টির কর্মীসভা, জনসভা করা হয়েছে। ২১ দফা আশু কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশব্যাপী প্রচার ও কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। ২১ দফার ভিত্তিতে পার্টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। ২০১৮ সালের ৩ মার্চ, ঢাকায় মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণের আন্দোলন ও সংগ্রামের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সময়কালে, রাজশাহী, গাংনী-মেহেরপুর, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, কক্সবাজার, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলায় জেলায় পার্টির নিজস্ব উদ্যোগে জনসভার কর্মসূচি ও সংগ্রামের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ছাত্রদের কোটাবিরোধী ও নিরাপদ সড়ক দাবীতে সংঘটিত আন্দোলনে পার্টি সঠিক অবস্থান নিলেও এই আন্দোলনেও খুব কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। নির্বাচন সামনে রেখেও জোটগত বা দলীয়ভাবে কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়নি । হেফাজত-জামাত-বি এন পি ও সন্ত্রাসী তান্ডবের প্রেক্ষিতে, ২০১৪ সালের নির্বাচন জনগণ গ্রহণ করলেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল না। তারা ঐ ধরণের নির্বাচনের পূনরাবৃত্তি চায়নি। কিন্তু ইতিপূর্বেকার উপজেলা, ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং সিটি কর্পোরেশনসহ একটি বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জনমনে অনাস্থা ও অবিশ্বাস তৈরী হয়েছিল। একাদশ সংসদ নির্বাচন তা ক্ষমতাসীন জোটের জন্য একেবারেই ইতিবাচক ছিল না।

২.৭৭ নির্বাচন পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের অনাস্থা ও অবিশ্বাস দূর তো হয়ইনি, বরং তা প্রচন্ড ধাক্কা খেয়েছে। ১৪ দলীয় ঐক্যজোটের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল, জনগণের ভোটাধিকারের উপর দাঁড়িয়ে বি এন পি-জামাত ও পরবর্তীকালে ঐক্যফ্রন্টের রাজনীতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার দৃঢ় বাস্তব অবস্থা তৈরী করা। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪ দল বিজয়ী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস প্রচন্ডভাবে আঘাত পেয়েছে। অপরদিকে, জোট হিসেবে আসন বন্টন থেকে শুরু করে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার নিয়ন্ত্রনাধীন প্রশাসনের ভূমিকা ও শরিক দলগুলির সংগে আচরণ, সবকিছুই ১৪ দলীয় ঐক্যের রাজনৈতিক ও কাঠামোগত ভিত্তির উপর আঘাত করেছে। নির্বাচনের পর সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় শরীক দলগুলির সংগে কোন রাজনৈতিক আলোচনা না করা, সরকার গঠনের পর শরীক দলগুলোকে বিরোধী দলে অবস্থানের পরামর্শ দেবার মত অরাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া, সবকিছুই ১৪ দলীয় রাজনৈতিক ঐক্য সংহত করার কোন রাজনৈতিক আচরণের প্রমান বহণ করে না। নির্বাচন পর্যালোচনায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির দিক দিয়ে শরীকদের প্রতি বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগের এই আচরণ ও দৃষ্টিভংগির তীব্র সমালোচনা করা হয়। তবে ১০ম কংগ্রেস মনে করে অবস্থিত বাস্তবতায় ১৪ দলীয় জোটের রাজনৈতিক প্রাসংগিকতা আছে। তবে সেটা কোনক্রমেই প্রধান নয়। বাস্তবত: ১৪ দলের কার্যকারিতা নেই। ভবিষ্যতে ১৪ দলের সংগে সম্পর্ক কি হবে সেটাও পরবর্তী বাস্তবতায় ঐক্য সংগ্রাম ঐক্য কৌশলের আলোকে কেন্দ্রিয় কমিটি নির্ধারণ করবে। যেটা জরুরী তাহলো, বিগত বছরগুলোতে জোট রাজনীতির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, পার্টির নিজস্ব শক্তিভিত মজবুত করাটাকেই প্রধান কাজ হিসেবে ১০ম কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

বি এন পি-জামাত নেতৃত্বে জোটঃ

২.৭৮ ২০০১ সালে ক্ষমতায় যাওয়া, ২০০৮ নির্বাচনে পরাজয় এবং পরবর্তীকালে সরকারবিরোধী সকল আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বি এন পি-জামাতের নেতৃত্বে ২০ দলীয় ঐক্যজোট তাদের একটি আদর্শগত রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরী করেছে। 'নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের' দাবীতে বি এন পি-জামাতের নেতৃত্বে ২০ দলীয় ঐক্যজোট ২০১৪ সালে মুখ্যতঃ সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। প্রতিরোধের নামে সন্ত্রাস, পেট্রল

বোমা নিক্ষেপে নিরীহ বাস-ট্রেনযাত্রীদের হত্যা, অবরোধ, হরতাল ও পুলিশ হত্যার মধ্য দিয়ে এই জোট জাতীয় নির্বাচন বর্জন করে এবং মূলতঃ প্রধান রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তারা সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা ও সরকার পতনের লক্ষ্য নিয়ে তাদের রাজনীতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। ২০১৪ সালে তাদের আন্দোলনের আর একটি মুখ্য কারণ ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল, জামাত নেতাদের সর্বোচ্চ শাস্তি বাতিল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক রাজনীতির নীতিগত বিরোধী অবস্থান সুদৃঢ় করা। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে নিজামী-মোজাহিদ-কাদের মোল্লা-সাকা চৌধুরীর মৃত্যুদন্ডসহ '৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি জামাতের সাংগঠনিক ভিত্তিতে আঘাত হানে, সেজন্যে তারাও মরিয়া হয়ে জ্বালাও পোড়াও রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় সংসদে তাদের অবস্থান না থাকলেও বিরোধীদল হিসেবে তারাই বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত থেকেছে। তার সংগে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আই এস আই এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মদদ । আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক অশুভ প্রভাব, আন্তর্জাতিক জংগীবাদের যোগসাজশে বি এন পি-জামাতই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামাজিক ন্যায্যতাভিত্তিক জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মানের বিপক্ষে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি - এটাই ছিল নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক বিবেচনা। নির্বাচনের পর এই শক্তি আপাত: শক্তিহীন মনে হলেও, এরাই দক্ষিণপন্থী শক্তির প্রধান ধারক। প্রগতির যেকোন ধারার বিরুদ্ধে এরাই মুখ্যশক্তি হিসেবে এখনো অবস্থান করছে।

২.৭৯ বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার 'জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট' মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডের সাজা ও গ্রেফতার হয়ে কারাগারে অবস্থান, লন্ডনে অবস্থানরত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তার ছেলে তারেক জিয়ার ১০ বছরের সাজা এবং আরও কয়েকটি মামলা বিচারাধীন থাকা মিলিয়ে বি এন পির নেতৃত্বের চরম শূন্যতা তৈরী হয়েছে। দ্রুত এই শূন্যতা পূরণ হবার নয়। অন্যদিকে, যুদ্ধাপরাধীদের সাজার মধ্য দিয়ে জামাতের শীর্ষনেতাদের মৃত্যুদন্ডের মধ্য দিয়ে, জামাতেরও নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরী হয়েছে। তাছাড়া '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে কৌশলগত অবস্থান নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সম্প্রতি তাদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা পদত্যাগ করে জামাতকে নতুন ধারায় রাজনীতি পূনর্বিন্যাস করার সুপারিশ করেছে। আপাত:দৃষ্টিতে জামাতের মূল নেতৃত্ব এর বিরোধীতা করলেও মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে জামাতের কৌশল এদেশেও তারা নিতে পারে। তাহলে, তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু করতে পারে।

হেফাজতকে ভিত্তি করে ধর্মাশ্রয়ী শক্তির নতুনকৌশল:

২.৮০ '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামাত বাংলাদেশে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রধান ধারা সন্দেহ নাই। '৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমানের প্রশ্রয়ে '৭১ এর পরাজিত শক্তি হয়েও তারা নতুন করে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। '৮০ ও '৯০ এর দশকের রাজনীতিতে তারা খুন, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের আশ্রয়স্থল হয়ে এবং এদেশের রাজনীতির ধারায় ভূমিকা রাখার নানা কৌশলের মধ্য দিয়ে, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রবল শক্তি হয়ে ওঠে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে বি এন পির সংগে আঁতাত করে তারা ক্ষমতায় আসে, মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে দক্ষিণপন্থী শক্তিকে তারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। এদেশের অর্থনীতিতেও তারা প্রবল শক্তি হয়ে ওঠে। বিগত এক দশকের রাজনীতির ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই শক্তিকে আপাত: হীনবল মনে হচ্ছে। কিন্তু, বাস্তবে অতটা নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মধ্য দিয়ে তাদের মূল নেতৃত্ব নি:শেষ হয়েছে। তারা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। কিন্তু তারা বি এন পিকে ভর করে নির্বাচন করেছে। প্রয়োজনে যে কোন মুখোশ তারা নিতে পারে, তার আলামতের কথা আগেই বলা হয়েছে। তারচাইতে বড় কথা-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় থেকে ধর্মীয় লেবাসধারী শক্তি 'হেফাজত ই ইসলাম' এর উত্থান এদেশের ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক শক্তিগুলি নতুন করে অবস্থান তৈরী করছে। তারা সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে, বেশ কিছু বিষয়ে তাদের দাবী মানাতে সরকারকে বাধ্য করেছে। সর্বশেষ কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তারা দৃশ্যমান শক্তি হিসেবে সামনে উপস্থিত। জামাত প্রকাশ্যে রাজনীতি করার অধিকার হারালেও তারা এসকল প্লাটফরমকে সহজেই ব্যবহার করতে পারবে। তাই, এটা স্মরণ রাখতে হবে, হেফাজত হতে পারে নতুন লেবাসে ধর্মাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আশ্রয়স্থল।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টঃ

২.৮১ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে মাহমুদুর রহমান মান্না, আ স ম আব্দুর রব, কাদের সিদ্দিকি প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন কয়েকটি রাজনীতিক দলের সমন্বয়ে মুখ্যতঃ তীব্র আওয়ামী লীগ বিরোধী অবস্থান থেকে এই জোট গড়ে উঠেছিল। প্রথমে ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরীর এই জোটের সঙ্গে ছিল। কিন্তু জামাতের সংগে সম্পর্ক রাখার প্রশ্নে দ্বিমত হওয়ায়, তাঁরা এই জোট ত্যাগ করে ১৪ দলের সংগে সমঝোতা করে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সুশাসন এর দাবীতে সামনে এলেও তাদের আওয়ামী লীগ বিরোধীতা এবং বি এন পি জামাত জোটের সংগে সমঝোতার দিকটিই ছিল প্রধান।

২.৮২ ডাঃ জাফরুল্লাহ প্রমুখ বুদ্ধিজীবিরা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তবে তাদের এই ঐক্যের ব্যাপারে জামাতসহ অন্যান্য কিছু বিষয়ে মতভেদ থাকলেও পর্দার অন্তরালে থাকা দেশী-বিদেশী শক্তির বিশেষ উদ্যোগে তারা শেষ পর্যন্ত ঐক্য তৈরী করতে সক্ষম হয়। সে ক্ষেত্রে দেশের রাজনীতিতে তা এক নতুন মাত্রা তৈরী করে এবং ক্ষমতাসীনদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। প্রকৃত অর্থে, এই ঐক্য ছিলো বি এন পি, জামাত নেতৃত্বেই ২০ দলীয় ঐক্যজোটের বর্ধিতরূপ। স্বাধীনতাবিরোধী অগণতান্ত্রিক চরম সাম্প্রদায়িক দলসমূহেরই জোট। জামাতের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা ছিল, কিন্তু নির্বাচনী সমঝোতায় জামাত থেকেছে। ঐক্যফ্রন্ট কার্যত: ঘুরিয়ে জামাতকে জায়েজ করেছে। তারা শেষ পর্যন্ত প্রধানত: বি এন পি জোটের ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করে। আগেই বলা হয়েছে, নির্বাচনে তাদের পরাজয় হয়েছে। নির্বাচনোত্তর কালে, এই জোট দৃশ্যত: বিপর্যস্ত হয়েছে। তারা কোন সমন্বিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, কিন্তু, তবুও তারা সম্ভাব্য প্রধান বিরোধী জোট। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে এ বিষয়টা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৮ দলীয় বাম জোটঃ

২.৮৩ নির্বাচনের পূর্বেই সি পি বি ও বাসদসহ আটটি বামদল বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলেছিল। তারা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বি এন পি জামাত উভয়কেই সমদূরত্বে রেখে তাদের বিপরীতে তৃতীয় ধারার রাজনীতি বিকাশের ঘোষণা দিয়েছিল। জাতীয় আন্তর্জাতিক উভয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভংগীগত পার্থক্য থাকলেও আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দল বিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের পরোক্ষ ঐক্য রয়েছে। ১৪ দলের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করলে বি এন পি জামাতের নেতৃত্বে ২০ দল ক্ষমতায় ফিরলে দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতির ধারার কি অবস্থা হবে এ বিষয়ে তাদের অবস্থান ছিল অস্পষ্ট। কার্যতঃ আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দলীয় জোটকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করাই ছিল তাদের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। তার ফলে, পরোক্ষভাবে তা বি এন পি-জামাত জোটের রাজনীতিকেই সহায়তা করছে। এখনও তাদের প্রধান লক্ষ্য বর্তমান সরকারের পতন। আওয়ামী লীগ বিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো বাম দলগুলোর সংগেও এদের সমঝোতার উদ্যোগ রয়েছে।

২.৮৪ দেশের ইসলামী দলগুলোকে পক্ষে রাখতে সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষ তৎপর রয়েছে। এটার অবস্থান নির্বাচনের পরও দেশের রাজনীতির চালচিত্রে প্রভাব বিস্তার করবে-তা এখন আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। আওয়ামী লীগ ও বিরোধী জোট উভয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ তার প্রমান। সম্প্রতি, সংসদে পার্টি সভাপতির হেফাজত সম্পর্কে একটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হেফাজতের নেতৃত্বে ধর্মীয় দলগুলি যে ব্যাপক আক্রমনাত্মক প্রচার চালায়, তা প্রমান করে, দক্ষিণপন্থী শক্তি কতটা বেপরোয়া।

বর্তমান বাস্তবতায় রাজনৈতিক কৌশল

২.৮৫ **পার্টি হবে মূল ভরকেন্দ্র :** সার্বিক বিবেচনায় শক্তিশালী পার্টি গড়ে তোলার বিকল্প নাই। **'পার্টি হবে মূল ভরকেন্দ্র'**। পরিবর্তিত বাস্তবতায় ১০ম কংগ্রেসের মূল শ্লোগান হচ্ছে , **'বিকল্প শক্তির দূর্গ গড়ো-তৃণমূলে পার্টি করো'**। এই শ্লোগানের তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝে তাকে প্রয়োগে নিতে গেলে বিগত প্রায় দেড় দশকের অর্থাৎ ২০০৩ সাল থেকে গড়ে ওঠা জোট রাজনীতির প্রেক্ষাপট কিছুটা উল্লেখ প্রয়োজন । ১৪ দল গঠনের পর দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে যেতে হয়েছে। এ সময়কালে মোটাদাগে কতকগুলো রাজনৈতিক অর্জন সম্ভব

হয়েছে যার বিস্তৃত পর্যালোচনা ৯ম কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাবে করা হয়েছে। প্রাসংগিকভাবে কিছু বিষয় পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। পার্টি স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রায় ৪ দশক ধরে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সামরিক স্বৈরাচার, বেসামরিক স্বৈরাচার, জংগীবাদী শক্তির মোকাবিলায় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির সংগে ঐক্য গড়েছে, লড়াই এগিয়ে নিয়েছে। ২০০১ সালের পর জংগী নেতা বাংলা ভাইএর বিরুদ্ধে সাহসী লড়াই এবং এরপর ২০০৪ সালে বি এন পি-জামাত ৪ দলীয় সরকারের দু:শাসনের বিরুদ্ধে 'বি এন পি-জামাত আর না' বলে একক একটি বামপন্থী দল হিসেবে ওয়ার্কার্স পার্টি রাজনৈতিক লড়াইয়ের গতি সঞ্চার করেছিল। আওয়ামী লীগের মত বড় দলও তখন মাঠে নামতে সাহস করেনি। ২০০৬ সালে ২৬ অক্টোবর যুব নেতা পার্টি কর্মী রাসেল আহমেদ খানের বুকের রক্ত দিয়ে ঐ অপশক্তির দু:শাসনকে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় ১১ দল এবং সর্বশেষ ১৪ দলের ঐক্যের মধ্য দিয়ে পার্টি সামরিক শক্তি সমর্থিত ফকরুদ্দিন-মইন ইউ সরকারের বিরুদ্ধে অন্দোলন ও পরিণতিতে ২০০৮ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দু'জন সাংসদ নিয়ে সংসদে অংশগ্রহণ করে। এরপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, '৭২ এর সংবিধান পুন:প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, খনিজ সম্পদ রফতানি নিষিদ্ধকরণ বিল উত্থাপনের মত পদক্ষেপ পার্টি গ্রহণ করে। এ ছাড়া বি এন পি-জামাতের তীব্র আক্রমন ও রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে নির্বাচনকালীন সরকারে অংশগ্রহণের সাহসী সিদ্ধান্ত, ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে এগিয়ে নেওয়া ও সাংবিধানিক ধারা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ নেওয়া, দেশে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষিত হবে নাকি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যাবে, সীমিত শক্তি নিয়ে, সে প্রশ্নটা মোকাবিলা করাটাও ছিল পার্টির কঠিন সিদ্ধান্ত। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে, এ সকল অভিজ্ঞতা ছিল এদেশের বামপন্থীদের জন্য নতুন। এ সকল অনুশীলন করতে গিয়ে, পার্টির ক্রটিবিচ্যুতি হয়েছে, তারজন্য তীব্র আত্মসমালোচনার পাশাপাশি, এ সকল অর্জনকে ধারণ করেই বর্তমান কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা করে এটা স্পষ্ট যে, যে প্রয়োজীয়তা ও বাস্তবতার ভিত্তিতে জোট রাজনীতি গত দেড় দশক অনুশীলন করা হলো, তার একটা স্তর (phase) অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন বাস্তবতা সামনে।

২.৮৬ ১৪ দলীয় ঐক্যের রাজনৈতিক প্রাসংগিকতা আছে এটা স্বীকার করেও ১০ম কংগ্রেস, পার্টির নিজস্ব উদ্যোগ, নিজস্ব ভিত্তি, নিজস্ব কাঠামো গড়ে তোলার কাজকেই মূল কাজ হিসেবে নির্ধারণ করে রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করছে। সেই লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও কাঠামোগত বিন্যাস দ্রুততার সংগে সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দ্র-তৃণমূলের যোগাযোগ শক্তিশালী ও সুশৃংখল করে তুলতে হবে ।

২.৮৭ **দেশের সকল অসাম্প্রদায়িক, বাম-গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। ১৪ দলের ভিতরে ও বাইরের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিসমূহকেও সমবেত করে অসাম্প্রদায়িক ও বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে সম্প্রসারিত করার রাজনৈতিক উদ্যোগে পার্টি সর্বাত্মক উদ্যোগী ভূমিকা নেবে।** তৃণমূলেও এই প্রয়াস জনগণের মধ্যে অব্যাহত রাখতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য বা জোট যথেষ্ট নয়, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে প্রতিহত করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বাম গণতান্ত্রিক শক্তিসহ সকল প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিকেও সংগঠিত করে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

২.৮৮ জোটের প্রধান দল আওয়ামী লীগ সংকট মুহূর্ত ছাড়া ১৪ দলকে কখনই কাঠামোগত ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে চায়নি। নির্বাচনের পর দৃশ্যত:ই জোট রাজনীতিকে আওয়ামী লীগ প্রাধান্য দিচ্ছে না অথবা প্রয়োজন মনে করছে না। আগেই বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির প্রবণতা বাড়ছে। এই নীতির যৌক্তিক পরিণতি হতে পারে চরম দলীয় সংকীর্ণতা ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, যার আলামত স্পষ্ট হচ্ছে - দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়বে। পার্টি মৌলবাদ, জংগীবাদ ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের বিরুদ্ধে যেমন সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, তেমনিই তার সংগে মিলিয়ে আজকের প্রয়োজনে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লড়াইএও পার্টিকে সামনে দাঁড়িয়ে জনগণকে নেতৃত্ব দেবার প্রস্তুতি নিতে হবে। এ লড়াই বিচ্ছিন্ন নয়, পরিপূরক। মনে রাখতে হবে, জনগণকে সম্পৃক্ত না করে কোন লড়াই জেতা যাবে না।

২.৮৯ **সার্বিকভাবে শক্তিশালী পার্টি গড়ে তোলার কোন বিকল্প নাই**। পার্টিকে শক্তিশালী করার শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্টিকে এই জটিল রাজনৈতিক মুহূর্তে নেতৃত্ব দেবার জন্য সাংগঠনিক, প্রচার ও আর্থিক সকল ক্ষেত্রেই এখন থেকেই সক্ষম হয়ে হয়ে ওঠার বাস্তব উদ্যোগ নিতে হবে। পার্টিকে শক্তিশালী করার এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে গেলে বিগত বছরগুলিতে পার্টির গৃহীত কর্মসূচী কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তার পর্যালোচনাও করতে হবে। ৯ম

কংগ্রেসে সঠিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল, "সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থানুকুল উদারনীতি, সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত বিশ্বায়ন এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বিরুদ্ধে মানুষকে সমবেত করতে হলে পার্টিকে আরও বিপুল মাত্রায় জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পার্টিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় ঘটেছে তার থেকে সৃষ্ট সকল ক্ষতিকর প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক লড়াই করতে হবে। গণসংগঠনগুলোর স্বাধীন অস্তিত্বকে দৃঢ় করতে হবে এবং গণপ্রভাব বিকাশের লক্ষ্যে তাদের বিকাশের উপর জোর দিতে হবে।" তাই, সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আজ জনগণের নিজস্ব দাবীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগ্রামের ভিত্তিতে তৃণমূল পর্যায়ে পার্টির কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। পার্টির প্রতিটি স্তরে পার্টি চাঁদা, লেভি পরিশোধ, নিয়মিত ও অনিয়মিত অর্থ সংগ্রহের সকল উদ্যোগ এখনই নিতে হবে। গণসংগঠনগুলিকে সাংগঠনিকভাবে বিন্যস্ত করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা ব্যাপকতর করার জন্য পার্টিকেই পরিকল্পনা নিতে হবে। কারণ, প্রায় সকল গণসংগঠন তাদের গণভিত্তি ও নিজস্ব শক্তিতে গণআন্দোলন ও নিজস্ব সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রেই হারিয়ে ফেলেছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেই পার্টির কাজ হাতে নিচ্ছে।

২.৯০ প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামো অনুসারে সারাদেশের পার্টি কাঠামো পূনঃর্বিন্যাসের কাজ শক্তহাতে ধরতে হবে।

২.৯১ দেশের এই রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে পার্টিকে জনগণের আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। রাজনৈতিক স্বচ্ছতা নিয়ে জনগণের সংগে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর শক্তি গড়ে তুলেই সকল সংকটের মোকাবিলা করতে হবে।

সার্বিক বাস্তবতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক করণীয় প্রস্তাবঃ

২.৯২ **এই মূহুর্তে প্রধান করণীয় পার্টিকে জনগণের মধ্যে দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড়া করানো**। তাই দ্রুততার সংগে এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে পার্টির নিজস্ব ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য সার্বিক পরিকল্পনা নিতে হবে। রাজনীতির মূল ভিত্তি হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা, উন্নয়ন অব্যাহত রাখা, দুর্নীতিরোধ, বেকারদের কাজের দাবী, বৈষম্য বঞ্চনা নিরসন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, কাজের নিশ্চয়তা, কৃষকের সার, বীজ, তেলে ভর্তুকি দেওয়া, কৃষকের কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম, ক্ষেতমজুরের কাজের নিশ্চয়তা ও মজুরি, খাসজমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন, নারী অধিকারসহ গ্রামীন কৃষিজীবি, শ্রমজীবি, শহরের শ্রমজীবি নারীদের সংগঠিত করে, হতদরিদ্রদের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ জনগণের নিজস্ব দাবীর ভিত্তিতে স্থানীয় ও জাতীয় আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা। প্রথমে প্রচার আন্দোলন, তারপর জনসম্পৃক্তির সংগে সংগে আন্দোলনের স্তর বাড়িয়ে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, যে কাজগুলোকে করতে হবে তাহলো, কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে পার্টির সকল স্তরে ঢিলেঢালা অবস্থাকে দৃঢ়হাতে দূর করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে পার্টি কাঠামোকে গণভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে।

২.৯৩ **জনগণের বিকল্প শক্তিভিত গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টে পার্টির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে**। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে **নিজস্ব প্রতীক 'হাতুড়ি' মার্কায়** নির্বাচনের সকল উদ্যোগ এখন থেকেই প্রস্তুত করতে হবে। কোথায় কোথায় নির্বাচন করা যায়, তা এখনই স্থির করা, কত সিটে নির্বাচন করা হবে তা নির্দিষ্ট করা। প্রতিটি স্তরে জনগণের নিজস্ব স্থানীয় ও জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শক্তিভিত ও নির্বাচনী এলাকা তৈরী করে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে নিতে হবে। তৃণমূলে প্রতিটি স্তরে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে আগামী ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। সম্ভাব্য এলাকা নির্ধারণ, প্রার্থী নির্ধারণ, এলাকায় পার্টি কাঠামো তৈরী, সকল গণসংগঠনের বিস্তৃতি, নির্বাচনী ফান্ড পরিকল্পনাসহ জনগণের নিজস্ব দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলে, তাকে ভিত্তি করে জনগণের মধ্যে নির্বাচনী অবস্থান তৈরি করতে হবে।

২.৯৪ আগামী বছরগুলোতে দৃশ্যমান শক্তিতে পরিণত হবার রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তরুণ নেতৃত্ব তৈরীর সাংগঠনিক পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

২১ দফা: একটি বিকল্প কর্মসূচী

২.৯৫ ২০১৮ সালে ৩ মার্চ, ঢাকায় মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে পার্টি ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। ১০ম কংগ্রেস প্রস্তাব করছে, সেই কর্মসূচীই চলমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় জনগণের সামনে আশু বিকল্প কর্মসূচী। ২১ দফায় আহ্বান করা হয়েছে যে, "বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি জনগণের সংগ্রামী নেতৃত্ব হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সেই বিকল্পই তুলে ধরছে দেশবাসীর কাছে। ওয়ার্কার্স পার্টি সামাজিক ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যাবে।" বলা হয়েছে, "ওয়ার্কার্স পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন পার্টি। সর্বোপরি ওয়ার্কার্স পার্টির আছে সুনির্দিষ্ট, আদর্শভিত্তিক ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি। আসুন, শ্রমিক-কৃষকসহ জনগণের নিজস্ব দাবির আন্দোলনের ভিত্তিতে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ২১ দফার ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলি।"

২.৯৬ পার্টি ২১ দফার ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোষণা দিয়েছে, তাকে সামনে নিয়ে সকল দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলে ঐতিহাসিক দায় কাঁধে তুলে নিতে হবে। সকল ত্রুটি বিচ্যুতিকে সারিয়ে, সামনে এগুতে হবে। মেহনতি মানুষের জয় হবেই।

॥॥॥॥॥